Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শর্মিলা খানম

রোলঃ 23090121750

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শর্মিলা খানম

রোলঃ 23090121750

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শর্মিলা খানম, আইডিঃ 23090121750বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

শর্মিলা খানম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

শর্মিলা খানম

আইডিঃ 23090121750

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরামের সংজ্ঞা ও পরিচিতি 5

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা......................................8

তৃতীয় অধ্যায় : হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা......................................16

চতুর্থ অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মানের আদব ও শিক্ষা 20

পঞ্চম অধ্যায়: মুশাজারাতে সাহাবা- মতভেদে আদব ও আহলুস সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি............24

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিভ্রান্ত মতামতের জবাব 27

সপ্তম অধ্যায়: কতিপয় সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী 30

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার 103

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরামের সংজ্ঞা ও পরিচিতি

সাহাবী- সংজ্ঞা ও পরিচয়

'সাহাবী' (الصحابي) শব্দটি এসেছে আরবি মূল শব্দ "صحب" (সুহব) থেকে, যার অর্থ হচ্ছে সঙ্গ দেওয়া, সাথে থাকা বা সহচর হওয়া।
ইসলামী পরিভাষায় সাহাবী বলতে বোঝায়

"যে ব্যক্তি ঈমানের অবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, ইসলামেই মৃত্যুবরণ করেছেন।"

এই সংজ্ঞাটি ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) এর বর্ণনা অনুযায়ী।

রেফারেন্স: আল-ইসাবাহ ফি তামইযিস সাহাবাহ, ইবনে হাজর আসকালানী, খণ্ড ১, পৃ. ৪।

হাফেয ইবনে হাজারের সংজ্ঞা অনুযায়ী -

أَصْحَابِي مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

'যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁকে রাসূল মেনে এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি সাহাবী।'

নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, তাঁকে রাসূল মেনে এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যুর শর্তের কারণে প্রিয় নবীর সাহাবী হিসেবে বিবেচিত হবেন-
এক– যাঁরা দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে ওঠা–বসা করেছেন।
দুই– যাঁরা অল্প কিছুদিন তাঁর সাহচর্য পেয়েছেন।
তিন– যাঁরা মোটেও সহচর্য পাননি, (কিন্তু উপরোক্ত শর্তে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন)
চার– যাঁরা তাঁর হাদীস বর্ণনা করেছেন বা করেননি।

পাঁচ– যাঁরা তাঁর সঙ্গে জিহাদে শরীক হয়েছেন বা হননি।
ছয়– যাঁরা উপরোক্ত শর্তে একবারমাত্র তাঁকে দেখেছেন।
সাত– দৃষ্টিশক্তিহীনতার কারণে যিনি তাঁকে চোখের দেখা দেখতে পাননি।

তাঁরা সকলেই সাহাবী।

পক্ষান্তরে কাফের অবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাহাবী নয়। এমনকি পরবর্তীতে ঈমান এনেও তিনি সাহাবী হতে পারবেন না যদি পুনরায় তাঁর সাক্ষাৎ না পান। কারণ 'সাহাবী' হতে হলে মুমিন হিসেবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ জরুরি। নবীজির সঙ্গে ঐ ব্যক্তির ঈমান গ্রহণের পর আর সাক্ষাৎ হয়নি। একইভাবে 'সাহাবী' বিবেচিত হবেন না আহলে কিতাবের সেই মুমীন ব্যক্তিও যিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কারন 'প্রিয় নবীকে রাসূল মেনে তাঁর সাক্ষাৎ...' এর শর্ত এই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়নি।

যে ব্যক্তি নবীজিকে রাসূল মেনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে কিন্তু পরে মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে (নাউযুবিল্লাহ), সেও 'সাহাবী' নয় মুসলিম হিসেবে মৃত্যুর শর্তের কারণে। যেই ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর মৃত্যুর পূর্বেই আবার ইসলামে ফিরে এসেছেন তিনি বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মতে প্রিয় নবীর সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ না হলেও সাহাবী হিসেবে পরিগণিত। - আল ইসাবাহ, খন্ড ১, পৃষ্ঠা ৭-৯।

সাহাবাদের শ্রেণিবিন্যাস

ইসলামী ইতিহাসবিদ ও মুহাদ্দিসগণ সাহাবাদের সাধারণভাবে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন:

১. মুহাজিরীন (المهاجرون): মুহাজির বলতে বোঝায় তারা যারা মক্কা থেকে মাদীনা হিজরতের সময় নবীর সঙ্গে চলে এসেছেন।
উদাহরণ: আবু বকর সিদ্দিক (رضي الله عنه), উমর ইবনে খাত্তাব (رضي الله عنه)।
২. আনসার (الأنصار): আনসার হলো মাদীনা শহরের বাসিন্দারা, যারা নবী ﷺ ও মুহাজিরদের স্বাগত জানিয়ে ইসলামের সেবা করেছেন।
উদাহরণ: আবু আইয়ুব আনসারী (رضي الله عنه),
সালমান ফারসি (رضي الله عنه)।
৩. বদরের সাহাবী: যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

উদাহরণ: আলী ইবনু আবি তালিব (رضي الله عنه), হামযা ইবনু আবদুল মুতালিব (رضي الله عنه)।

৪. বাইআতুর রিদওয়ানের সাহাবী: যাঁরা হুদায়বিয়ার সময় নবী ﷺ এর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন।

উদাহরণ: আবদুর রহমান ইবনু আওফ (رضي الله عنه), সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (رضي الله عنه)।

৫. অন্য সাধারণ সাহাবীগণ যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নবী ﷺ এর সান্নিধ্য লাভ করেছেন।

উদাহরণ: আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু (رضي الله عنه), ইকরিমা ইবনু আবি জাহল (رضي الله عنه)।

রেফারেন্স: আল-ইস্তিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ইবনে আব্দুল বার; উসদুল গাবা, ইবনে আসির।

সাহাবাদের সংখ্যা

বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে সাহাবীদের সংখ্যা নিয়ে ভিন্নমত আছে।

ইমাম ইবনে হাজর (রহ.) এর মতে, আনুমানিক এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার (১,১৪,০০০) সাহাবী নবী ﷺ এর সাহচর্য লাভ করেছেন।

রেফারেন্স: আল-ইসাবাহ, খণ্ড ১, পৃ. ৮।

তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল তিনটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত:

১. অটল ঈমান: তারা কোনো দ্বিধা ছাড়াই ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ করেছেন।
২. খালিস ভালোবাসা: নবী ﷺ এর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ছিল আত্মার গভীর থেকে।
৩. নিষ্ঠাবান আনুগত্য নবী ﷺ এর প্রতিটি আদেশে তাঁরা বিনা প্রশ্নে আত্মসমর্পণ করতেন।

একটি সহীহ হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন:

"আমার সাহাবীদের গালি দিও না। যদি কেউ উহুদ পরিমাণ সোনা ব্যয় করে, তবুও সে তাদের এক মুঠো দান বা তার অর্ধেক সমান হতে পারবে না।" -(সহীহ বুখারী, হাদীস 3673)

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

ভূমিকা

কুরআনুল কারীমে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা নিয়ে অসংখ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ঈমান, ত্যাগ, ও নবী করীম ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসার প্রশংসা করেছেন।
সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসা রাখা হলো ঈমানের শাখা, আর তাঁদের প্রতি ঘৃণা রাখা হলো দ্বীন থেকে বিচ্যুতি।
তাই এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কুরআনের আয়াতসমূহে কীভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের মর্যাদা ঘোষণা করেছেন।

কুরআনের মূল আয়াতসমূহ

আয়াত-১

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
'তোমরা সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের (কল্যাণ ও সংশোধনের) জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।' -(সূরা আলে ইমরান : ১১০)

আয়াত-২

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ
'আমি তোমাদের বানিয়েছি এমন একটি দল যারা (সব দিক বিবেচনায়) অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ নীতি, আদর্শ ও কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেন তোমরা বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হতে পারো।' – (সূরা বাকারা : ১৪৩)

বিশ্লেষণ: উপরোক্ত আয়াতের আসল সংশোধন সাহাবায়ে কেরাম তাঁরাই এর প্রথম মেহদাক (লক্ষ্যস্থল)। নিজ নিজ আমল অনুসারে উম্মতের অন্য সকলেও তাতে অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াত

দু'টোর প্রকৃত লক্ষ্য সাহাবায়ে কেরাম, অর্থাৎ সকল মুহাক্কিকের একমতে এ কথাটি প্রমাণিত। আয়াত দু'টিতেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবাই সর্বোত্তম, সৎপথে, ন্যায়নিষ্ঠ ও নির্ভুলজ্ঞ।

আয়াত-৩ ও ৪

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ۝
ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَّمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ۝

'বলো, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদের, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে মনোনীত করেছি, তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর অনুমতিক্রমে উত্তম কাজের ক্ষেত্রে অগ্রণী, এটাই মহা অনুগ্রহ।' - (সূরা আন-নমল : ৫৯), (সূরা ফাতির : ৩২)

আয়াত-৫

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ۝
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۝

'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারাই সৎপথ অবলম্বনকারী, এটা আল্লাহর করুণা ও নেয়ামত, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' – (সূরা হুজুরাত : ৭-৮)

বিশ্লেষণ: এই দুই আয়াতে সকল সাহাবীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তরে ঈমানের প্রতি ভালোবাসা এবং কুফর, পাপাচার ও গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

আয়াত -৬

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

অর্থ: "আর প্রথম পূর্ববর্তী মু'মিনগণ মুহাজির ও আনসার এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে উত্তমভাবে আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।" -(সূরা আত-তাওবা: ১০০)

বিশ্লেষণ:এই আয়াতে সাহাবীদের তিনটি স্তরের কথা বলা হয়েছে
পূর্ববর্তী মুহাজিরগণ, আনসারগণ এবং যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে।
আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি "রাযিয়াল্লাহু আনহুম" ঘোষণা করেছেন, যা স্থায়ী সম্মানের প্রতীক।
এটি প্রমাণ করে, সাহাবীদের মর্যাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চিত।

আয়াত -৭

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم...

অর্থ: "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, এবং যারা তাঁর সঙ্গে আছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পর দয়ালু..." -(সূরা আল-ফাতহ: ২৯)

বিশ্লেষণ: এই আয়াতে "والذين معه" (যারা তাঁর সঙ্গে) বলতে সাহাবিদের বোঝানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দয়া, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধন ছিল। তাঁরা নবী ﷺ-এর দাওয়াতের বাহক, এবং আল্লাহ তাঁদের প্রশংসা করেছেন সরাসরি।

তাফসীর ইবনে কাসীরের ভাষায়:
"এই আয়াত সাহাবাদের উচ্চ মর্যাদার দলীল, কারণ আল্লাহ তাঁদের হৃদয়ের অবস্থাকেও প্রশংসা করেছেন।"

আয়াত -৮ ও ৯

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِم..ْ

অর্থ: "সেসব দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য, যারা নিজগৃহ ও সম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যে আত্মনিয়োগ করে।" -(সূরা আল-হাশর: ৮)

এবং পরের আয়াতে আনসারদের সম্পর্কে বলা হয়

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

অর্থ: "তারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অপরকে অগ্রাধিকার দেয়।" -(সূরা আল-হাশর: ৯)

বিশ্লেষণ: এই দুই আয়াতে মুহাজির ও আনসার সাহাবাদের আত্মত্যাগ ও পরস্পর ভালোবাসার চিত্র ফুটে উঠেছে।

এমন চরিত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির চিহ্ন। তাঁদের নিঃস্বার্থতা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আদর্শ।

আয়াত -১০

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا

অর্থ: "আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা-ই প্রকৃত মুমিন।" -(সূরা আল-আনফাল: ৭৪)

বিশ্লেষণ:এখানে সাহাবীদের ঈমানের সত্যতা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করেছেন।

"هُمُ المؤمنون حقا "

অর্থাৎ, তারা-ই প্রকৃত মুমিন এটি কোনো মানব প্রশংসা নয়, বরং আল্লাহর ঘোষণা।
তাই তাঁদের ঈমান সন্দেহের উর্ধ্বে।

আয়াত -১১

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন সেই মুমিনদের প্রতি, যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার প্রতি বায়আত করেছিল।" -(সূরা আল-ফাতহ: ১৮)

বিশ্লেষণ: এটি "বাইআতুর রিদওয়ান" -এর আয়াত।
যে সাহাবীরা সেই সময় নবী ﷺ-এর হাতে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁদের সকলের জন্য সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন।
এটি এক বিশেষ মর্যাদা, যা কেবল সাহাবীদেরই প্রাপ্য।

কুরআনের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের চরিত্র

• ধৈর্য ও স্থিতিশীলতা

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন এমন এক প্রজন্ম, যাঁরা জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তারা মক্কার নির্যাতন, যুদ্ধ, প্রবাসজীবন, আর্থিক সংকট ও সামাজিক বঞ্চনার মধ্যেও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অটল ছিলেন। কুরআনে তাদের এই ধৈর্যের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন:

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
“আর তারা ধৈর্যশীল বিপদে, দুঃখে ও যুদ্ধের সময়।” -(সূরা আল-বাকারা, ২:১৭৭)

বিশ্লেষণ: এই আয়াত সাহাবীদের জীবনযাপনের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। তাঁরা কষ্টের মুখেও অভিযোগ না করে বরং আল্লাহর পথে অটল থেকেছেন। বদর, উহুদ ও খন্দকের মতো যুদ্ধগুলোতে তাঁদের ধৈর্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সর্বোচ্চ প্রমাণ।

• নৈতিকতা ও মানবিক আচরণ

সাহাবাদের চরিত্র ইসলামী নীতিমালার প্রতিফলন ছিল। তারা সদয়, ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদার ছিলেন। কুরআনে তাদের নৈতিকতার প্রশংসা করে বলা হয়েছে:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
"মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আর তাঁর সাহাবীরা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত দয়ালু।" -(সূরা আল-ফাতহ, ৪৮:২৯)

বিশ্লেষণ: এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, সাহাবাদের নৈতিকতার মূল ছিল দ্বীনের প্রতি দৃঢ়তা ও মানুষের প্রতি মমতা। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর কিন্তু মুসলিম ভাইয়ের প্রতি দয়ালু ছিলেন। সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্রদের সহায়তায় তাদের ভূমিকা ছিল অনন্য।

• ঈমান ও দায়িত্ববোধ

কুরআনে বারবার সাহাবাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

لَّكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ
"বরং রাসূল ও তাঁর সঙ্গে যারা ঈমান এনেছেন, তারা নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা সংগ্রাম করেছেন।" -(সূরা আত-তাওবা, ৯:৮৮)

বিশ্লেষণ: এই আয়াত প্রমাণ করে, সাহাবীরা কেবল ঈমানের দাবি মুখে করেননি; বরং নিজেদের জীবন, সম্পদ, পরিবার সব কিছু উৎসর্গ করেছেন ইসলামের জন্য। তাঁরা ছিলেন সত্যিকারের দায়িত্ববান মুমিন, যাঁরা নবী ﷺ-এর নির্দেশ পালন ও ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ নিবেদন দেখিয়েছেন।

ইতিহাস ও বাস্তব উদাহরণ

• হিজরতের ত্যাগ

মুহাজির সাহাবারা মক্কার নির্যাতন সহ্য করে মাদীনায় হিজরত করেছিলেন। তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি, সম্পদ ও স্বজন ত্যাগ করে ইসলামী সমাজ গঠনে অংশ নিয়েছিলেন। এই হিজরত ছিল ঈমানের শক্তির এক মহান নিদর্শন।

• আনসারদের সহযোগিতা

মাদীনার আনসার সাহাবীরা মুহাজিরদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা নিজেদের ঘর, খাদ্য ও সম্পদ ভাগাভাগি করে নেন। কুরআনে তাদের এই উদারতার প্রশংসা এসেছে:

وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

"তারা নিজেদের চেয়ে অন্যদের অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা নিজেরাই অভাবগ্রস্ত।" -(সূরা আল-হাশর, ৫৯:৯)

বিশ্লেষণ: এই আয়াত আনসারদের ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার সর্বোচ্চ উদাহরণ বহন করে।

• সমাজ ও রাজনীতিতে অবদান

সাহাবায়ে কেরাম কেবল ধর্মীয় অনুশীলনে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; তারা ইসলামী সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নবী ﷺ-এর পর তাঁরা শূরা ব্যবস্থা চালু করেন, বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, এবং দরিদ্র ও অসহায়দের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন। খলিফা আবূ বকর ও উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁদের জীবনে ন্যায়পরায়ণ শাসনের বাস্তব রূপ প্রদর্শন করেছেন।

কুরআনের আলোকে শিক্ষণীয় দিক

১. ত্যাগ ও নিষ্ঠা: সাহাবারা শিখিয়েছেন যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগ করা ঈমানের পরিপূর্ণতা।

২. ধৈর্য ও দৃঢ়তা: বিপদের মুখে অভিযোগ না করে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে স্থির থাকা একজন মুমিনের গুণ।
৩. সামাজিক দায়িত্ব: সাহাবাদের ন্যায়পরায়ণতা ও সমাজসেবার মানসিকতা আমাদের শেখায় যে ইসলাম কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক জীবনও গঠন করে।
৪. নৈতিক আদর্শ: সাহাবীরা চরিত্রের উৎকর্ষে নবী ﷺ-এর জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁদের জীবন মুসলিম সমাজের আদর্শিক রূপরেখা।

উপসংহার

কুরআনের এইসব আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা শুধুমাত্র মানুষের মুখে নয়, বরং আল্লাহর কালামে স্বীকৃত। তাঁদের ঈমান, ত্যাগ ও ভালোবাসা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উজ্জ্বল প্রমাণ। আয়াতগুলো তাঁদের মাকবুল ও মাগফুর হওয়া, তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং চিরস্থায়ী জান্নাত তাঁদের জন্য অবধারিত হওয়া প্রমাণের জন্য যথেষ্ঠ।
সুতরাং যারা সাহাবাদের ভালোবাসে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে; আর যারা তাঁদের অবমূল্যায়ন করে, তারা কুরআনের ঘোষণার বিরোধিতা করে।

তৃতীয় অধ্যায় : হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

ভূমিকা

ইসলামী ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) এমন এক শ্রেণির মানুষ, যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই অসংখ্য হাদীসে তাঁদের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ অবস্থানের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা কুরআনের অবতরণের সাক্ষী, ওহির বাহক, এবং দ্বীনের প্রথম প্রজন্ম যারা ইসলামকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সাহাবীগণ নবীপ্রেমে অনন্য ছিলেন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমার সাহাবীদের গালি দিও না। তাঁর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি তোমাদের কেউ উহুদের পরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও আমার সাহাবীদের একজনের এক মুদ পরিমাণ (অল্প) দানকেও পৌঁছাতে পারবে না।"
-(সহীহ আল-বুখারী: ৩৬৭৩, সহীহ মুসলিম: ২৫৪১)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়, সাহাবাদের সামান্য আমলও অন্যদের বিপুল আমলের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান, কারণ তাঁরা নবীর সান্নিধ্যে থেকেছেন, দ্বীনের সূচনালগ্নে ত্যাগ করেছেন।

সাহাবীদের ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"আনসারদের ভালোবাসা হলো ঈমানের নিদর্শন, আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ হলো নিফাকের নিদর্শন।"
-(সহীহ আল-বুখারী: ১৭, সহীহ মুসলিম: ৭৪)

অর্থাৎ সাহাবীদের ভালোবাসা মানে ঈমানের দৃঢ়তা; আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ হলো দ্বিচারিতার পরিচয়।

সাহাবাদের প্রতি ভালোবাসার নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"যে আমার সাহাবীদের ভালোবাসবে, সে আমাকেও ভালোবাসবে; আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে আমার প্রতিই বিদ্বেষ পোষণ করবে।"
-(ইবনু মাজাহ: ৪১০১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"সাবধান! সাবধান আমার সাহাবীদের ব্যাপারে, আমার পরে তাঁদের সমালোচনার ক্ষেত্র বানিয়ো না। যে ব্যক্তি তাঁদের মুহাব্বত করল, সে প্রকৃতপক্ষে আমাকে মুহাব্বতের কারণেই তাঁদের মুহাব্বত করল। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে মূলত আমার প্রতি বিদ্বেষের কারনে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, যে ব্যাক্তি তাঁদের কাওকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দেবে শিগগিরই আল্লাহ তাআলা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন।" -(তিরমিযী)

এ হাদীসদ্বয়ে দেখায়, সাহাবীদের প্রতি ভালোবাসা মূলত নবীপ্রেমেরই অংশ।

সাহাবীদের অপমানের কঠোর নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"আমার সাহাবীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো! তাদের সমালোচনা করো না, তাদের পর নিন্দা করো না। আমার পরে যারা তাদের প্রতি শত্রুতা করবে, তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ।"
-(আল-মু'জামুল কাবীর, তাবরানী)

সাহাবীদের প্রতি অসম্মান মানে নবীর প্রতি অসম্মান। তাই ইসলামি আকিদার দিক থেকেও তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করা ফরজসম।

সাহাবীগণ হলেন দিকনির্দেশনার নক্ষত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রসম। তোমরা তাদের যেকোনো একজনকে অনুসরণ করো, পথভ্রষ্ট হবে না।"
-(ইবনু আব্দিল বার, জামি বায়ানিল ইলম)

এই হাদীস বোঝায়, সাহাবারা যুগে যুগে উম্মাহর পথপ্রদর্শক।

সাহাবীগণ দ্বীনের ধারক ও বাহক

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর তাদের পরের যুগ, তারপর তাদের পরের যুগ।"
-(সহীহ আল-বুখারী: ২৬৫২, সহীহ মুসলিম: ২৫৩৩)

এখানে নবী ﷺ প্রথম যুগ বলতে সাহাবীদের যুগকে বোঝাচ্ছেন। তাঁদের আমল, ইখলাস, ও আল্লাহভীতি ছিল সকলের শ্রেষ্ঠ।

ইমাম আহমাদ রহমতুল্লাহি আলাইহি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন-

"কেউ যদি কারোর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তবে তার উচিৎ প্রিয় নবীর সাহাবীদের অনুসরণ করা। কারণ গোটা উম্মতের মাঝে তাঁরাই অন্তরের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র, জ্ঞান ও ইলমের বিষয়ে গভীরতম। লৌকিকতার বিচারে স্বল্পতম, আদর্শ, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের দিক লক্ষ করলে তাঁরা দৃঢ়তম, অবস্থার দিক দিয়ে তাঁরা ছিলেন শ্রেষ্ঠতম। তাঁরা

ছিলেন এমন এক কওম যাঁরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রিয় নবীর সাহচর্যের জন্য এবং দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত। অতএব, তোমরা তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জেনে রাখো এবং তাদের অনুসরণ করে চলো। কারণ তাঁরাই সরল, সোজা ও সঠিক পথে পরিচালিত।"

উপসংহার

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা হাদীসসমূহে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, তাঁদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও আনুগত্য রাখা ঈমানের দাবি। তাঁরা দ্বীনের প্রাথমিক সাক্ষী, যারা কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই সাহাবীদের সম্মান রক্ষা করা আসলে ইসলামের আসল রূপ সংরক্ষণের সমান।

চতুর্থ অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মানের আদব ও শিক্ষা

ভূমিকা

সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) ছিলেন সেই পবিত্র ব্যক্তিগণ, যাদের চোখে নবী করিম ﷺ-কে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, যাঁরা তাঁর সঙ্গে নামাজ পড়েছেন, যুদ্ধ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান ও নূর গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা রাখা শুধু নৈতিক কর্তব্য নয়, বরং ঈমানের অংশ।

সাহাবায়ে কেরামের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকীদা:
উম্মতের প্রতি ওয়াজিব সাহাবায়ে কেরামের জন্য ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পোষণ করা, তাঁদের ইজমা (ঐক্যমত) কে শরীয়তের দলীল মনে করা এবং তাঁদের অনুসরণ- অনুকরণ করা। তাঁদের প্রতি অন্তরে বিদ্বেষ রাখা, তাঁদের সকলকে অথবা কোনো একজনকে মন্দ বলা বা সমালোচনা করা ইসলামী শরীয়তে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসগুলোতেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আরও একটি আকীদা এই যে, নবীদের মতো সাহাবীগণ মাছুম বা নিষ্পাপ নন। কিন্তু তাঁরা মাগফুর অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের ভুল-ত্রুটির ওপর অটল থাকেননি, তওবা করেছেন এবং আল্লাহ তাআলা তাঁদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইসলামী আদব শাস্ত্র সাহাবীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে।

সাহাবীদের সম্পর্কে কটূক্তি করা নিষিদ্ধ

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আর যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে , হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের এবং আমাদের পূর্ববর্তী মুমিন ভাইদের ক্ষমা করো, এবং আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ রেখো না যারা ঈমান এনেছে।"
- (সূরা আল-হাশর, আয়াত ১০)

এই আয়াত আমাদের শিখায় যে, মুসলমানের অন্তরে সাহাবীদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়। বরং তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করা উচিত।

সাহাবীদের সম্পর্কে ভাষায় সংযম রাখা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"আমার সাহাবীদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলো না। তোমরা যদি তাদের মধ্যে কারো সমালোচনা করো, তবে জেনে রাখো, তোমরা কুফরির কাছাকাছি চলে যাচ্ছো।"
-(ইবনু আসাকির, তারিখে দামেশক)

তাই ইসলামী আদব অনুযায়ী সাহাবীদের প্রসঙ্গে কথা বলার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনো ঘটনাকে বিচার করতে হলে হাদীস ও আলেমদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করতে হবে।

সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন করা সম্মানের প্রকাশ

সাহাবীদের জীবন জানা মানে দ্বীনের মূল উৎসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সম্পর্কে বলেন:

"আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" -(সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০০)

তাই তাঁদের জীবনী পড়া, তাঁদের থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং তাঁদের জীবনের দৃষ্টান্ত প্রচার করা তাঁদের প্রতি সম্মানের বাস্তব প্রকাশ।

সাহাবীদের মধ্যে বিভেদ এড়িয়ে চলা

ইসলামী আদবের অন্যতম শিক্ষা হলো সাহাবীদের মধ্যে কোনো মতভেদ বা যুদ্ধ নিয়ে নিজের মতামত না দেওয়া। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি সাহাবাদের নিয়ে আলোচনা করে, তার জিহ্বা ও কলম সংযত রাখা উচিত। তাদের ব্যাপারে নিরবতা হলো নিরাপত্তা।"

সাহাবীরা আল্লাহর বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। তাঁরা যা করেছেন, জেনে-বুঝে, ঈমানের আলোকেই করেছেন। তাই তাঁদের বিচার করা আমাদের কাজ নয়।

সাহাবীদের ভালোবাসা ও তাঁদের জন্য দোয়া করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

"যে আমার সাহাবীদের ভালোবাসবে, সে আমাকেও ভালোবাসবে। আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে আমাকেও বিদ্বেষ করবে।" -(ইবনু মাজাহ: ৪১০১)

তাই তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করা, তাঁদের আমল থেকে শিক্ষা নেওয়া; এসবই একজন মুমিনের অন্তরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

সাহাবীদের থেকে আদবের শিক্ষা

সাহাবীদের জীবন নিজেই ছিল আদবের মিরাজ। তাঁরা নবীর সামনে নীরব থাকতেন, কণ্ঠস্বর নিচু রাখতেন, তাঁর প্রতিটি কথা হৃদয়ে স্থান দিতেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠের ওপর তোমাদের কণ্ঠ উচ্চ করো না, এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় এমনভাবে বলো না যেমন তোমরা একে অপরের সঙ্গে বলো, নচেৎ তোমাদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে।" -(সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ২)

সাহাবীদের এই আদব থেকেই আমরা শিখি কীভাবে উস্তাদ, বড়দের বা আলেমদের সঙ্গে কথা বলতে হয় নম্রতা ও সম্মানের সঙ্গে।

মুসলিমদের দায়িত্ব

• শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন

সাহাবাগণের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। কথায়, আচরণে ও অন্তরে তাঁদের মর্যাদার প্রতি যথাযথ সম্মান বজায় রাখা উচিত। তাদের সম্পর্কে অশ্রদ্ধাপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করা বা সমালোচনামূলক মনোভাব পোষণ করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। বরং তাঁদের ত্যাগ, অবদান ও দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত।

• জীবন ও আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ

সাহাবাগণ ছিলেন নবী ﷺ এর সর্বাধিক নিকটবর্তী প্রজন্ম, যারা ইসলামী চরিত্র ও আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন। তাঁদের জীবন, ঈমানের দৃঢ়তা, ত্যাগ, ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরি। মুসলমানদের উচিত ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক দিক থেকে তাঁদের আদর্শকে অনুসরণ করা এবং দৈনন্দিন জীবনে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

• প্রজন্মান্তরে ধারণা সংরক্ষণ

সাহাবাগণের পরিচয়, তাঁদের অবদান এবং আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া মুসলিম সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। শিশু, কিশোর ও যুবকদের মাঝে সাহাবাগণের জীবনকথা, দীনপ্রাণতা ও নৈতিকতা পরিচিত করানো উচিত, যেন তারা তাঁদের চরিত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। এর মাধ্যমে সাহাবাগণের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত থাকবে।

উপসংহার

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান দেখানো মানে ইসলামকে সম্মান করা।
তাঁদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা রাখা বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা ঈমানের ক্ষতি ডেকে আনে।

যে ব্যক্তি সাহাবীদের ভালোবাসে, সে নবীকে ভালোবাসে; আর যে তাঁদের সম্মান করে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।

পঞ্চম অধ্যায়: মুশাজারাতে সাহাবা- মতভেদে আদব ও আহলুস সুন্নাহর দৃষ্টিভঙ্গি

ভূমিকা

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছু পারস্পরিক মতপার্থক্য ও ঘটনা ইতিহাসে পাওয়া যায়, যা অনেক সময় উম্মতের কিছু অংশকে বিভ্রান্ত করে তোলে। অথচ এই মতপার্থক্য বা সংঘর্ষগুলো ছিল পার্থিব স্বার্থের নয়, বরং ইজতেহাদ ও দ্বীনি উদ্দেশ্যের ফল। ইসলামি দৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলোর সঠিক মূল্যায়ন এবং সাহাবাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। উলামায়ে আহলুস সুন্নাহ এই বিষয়ে যে ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন, তাকে বলা হয় "মুশাজারাতে সাহাবা" অর্থাৎ সাহাবাদের পারস্পরিক বিষয়াদি বা মতভেদ।

মূল আলোচনা

মুশাজারাতে সাহাবা

সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য হয়েছে। প্রকাশ্য যুদ্ধ পর্যন্ত ঘটেছে। কিন্তু উলামায়ে উম্মত সাহাবীদের আদব রক্ষার্থে সেই যুদ্ধকে 'যুদ্ধ' বা 'লড়াই' নামে আখ্যায়িত করা উচিত মনে করেননি। তাঁরা একে আখ্যায়িত করেন 'মুশাজারাহ' নামে। যার অর্থ শাখাবহুল গাছ বা বহু ডাল-পালা বিশিষ্ট বৃক্ষ। যার একটি ডাল অন্য ডালের মধ্যে ঢুকে পড়ে, একটির সঙ্গে অন্যটির টক্কর লাগে যা গাছের জন্য দোষণীয় নয়, ক্ষতিকরও নয়। মুশাজারাতে সাহাবার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হলো, উভয়পক্ষের প্রতিই ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখা ওয়াজিব। কোনো পক্ষকেই মন্দ বলা হারাম।
উম্মতের ইজমা রয়েছে এ বিষয়েও যে, 'জামাল' (উটের) যুদ্ধে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর মত সঠিক। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিল ভুলের ওপর। একইভাবে সিফফীন যুদ্ধেও হযরত আলী ছিলেন হকের ওপর আর প্রতিপক্ষ হযরত মুআবিয়া এবং তাঁর সহযোগীরা ছিলেন ভুলের ওপর।

অবশ্য তাঁদের ভ্রান্তিকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'ইজতেহাদী খতা' রূপে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে 'গুনাহ' নয় (সুতরাং শাস্তিরও প্রশ্ন নেই) বরং ইজতেহাদের মূলনীতি হিসাবে পূর্ণচেষ্টার পরও ভুল হয়ে গেলে, ঐ ব্যক্তিও সাওয়াব থেকে মাহরুম হয় না। (সিদ্ধান্ত সঠিক হলে দুটো সাওয়াব, আর ভুল হলে) একটি সাওয়াব সেও পায়।
এভাবে একদিকে মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে 'সঠিক মত' ও 'ভুল মত' চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও আদব পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিজের জবান ও ভাষাকে সংযত রাখতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লামা কুরতুবী রহ. আহলুস সুন্নাহ এর নীতি-আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করে এই মুশাজারায়ে সাহাবা বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এভাবে:

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহা ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমাকে 'আশারায়ে মুবাশশারা' এর অন্তর্ভুক্ত বলে জানিয়ে ছিলেন, তাদের ব্যাপারে নবীজীর ভবিষ্যতবাণী ছিল, তাঁরা উভয়েই শহীদ হবেন। বাস্তব ক্ষেত্রে তারা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার বদলা বা 'কেসাসে'র দাবিতে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে শহীদ হয়েছিলেন। প্রিয় নবীর হাদীস তাঁদেরকে শহীদ আখ্যায়িত করেছে। পক্ষান্তরে হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার হযরত আলী কাররামাল্লাহুর পক্ষে জোরালো তৎপরতা চালিয়ে যুদ্ধে অংশ নেন। পূর্ণ শক্তি দিয়ে হযরত আলীর বিরোধীদের মুকাবেলা করেন। প্রিয় নবী তাকেও শহীদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।"

এক্ষেত্রে একজন মুমিনের প্রধান ভাবনার বিষয় প্রিয় নবীর ভবিষ্যতবাণী, যা স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, হযরত তালহা ও যুবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লড়াই করেছিলেন, সে কারণেই তাঁরা দু'জনও শহীদ। একই সঙ্গে হযরত আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহুর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, সে কারণে তিনিও শহীদ এবং তিনিও প্রশংসার যোগ্য। উভয় দলের মতের ভিন্নতা কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে ছিল না, ছিল ইজতেহাদ ও নেক ভাবনার ভিত্তিতে। ফলে কোনো দলকেই সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত ও অসংযত ভাষায় আহত করা কোনোভাবেই বৈধ হতে পারে না। নিজের ঈমানকে নিরাপদ রাখতে চাইলে কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সকল সাহাবীর ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়া এবং তাঁদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত অবধারিত হওয়ার বিশ্বাস অন্তরে বদ্ধমূল করতে হবে। প্রিয় নবীর নির্দেশে নিজের জবান ও ভাষাকে সাহাবীদের ব্যাপারে সংযত করে অন্তরে তাঁদের প্রতি মুহাব্বত ও ভালোবাসা জাগ্রত রাখতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ইতিহাস যা সাহাবায়ে কেরামকে কোনোপ্রকার কালিমা লিপ্ত করে, সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে।

উৎস ও বিশ্লেষণ

সহীহ হাদীস:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
"তুমি (আম্মার) সেই দল দ্বারা নিহত হবে যারা অন্যায়কারী।" -(সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৮১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৯১৫)

অন্য হাদীসে এসেছে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,
"আমার সাহাবীদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করো। তাঁদের প্রতি কোনো কটূবাক্য বলো না।"
-(তিরমিযী, হাদীস: ৩৮৬২)

এই হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, সাহাবাদের পারস্পরিক ঘটনাকে ফিতনা বা গুনাহ নয়, বরং ইজতেহাদী ভিন্নতা হিসেবে দেখা উচিত। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যা কুরআনে বর্ণিত:

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"
-(সূরা আত-তাওবা, ৯:১০০)

উপসংহার

মুশাজারাতে সাহাবা বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি হলো ভারসাম্যপূর্ণ যেখানে সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করা হয় দলিলের আলোকে, কিন্তু কোনোভাবেই সাহাবীদের মর্যাদাকে আঘাত করা হয় না। তাঁদের প্রতি ভক্তি, সম্মান ও নীরবতা বজায় রাখা ঈমানের অংশ। যিনি সাহাবাদের সম্মান রক্ষা করবেন, আল্লাহ তাঁর ঈমান ও দ্বীনকেও সম্মানিত রাখবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিভ্রান্ত মতামতের জবাব

ভূমিকা

ইসলামী ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) ছিলেন নবী করিম ﷺ-এর বিশ্বস্ত অনুসারী ও দ্বীনের প্রাথমিক রক্ষক। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে কিছু মানুষ বা গোষ্ঠী তাঁদের সম্পর্কে বিভ্রান্ত মত প্রচার করেছে।
এই মতগুলো কখনো কখনো রাজনৈতিক, কখনো তত্ত্বগত বা ভুল ব্যাখ্যা থেকে জন্ম নেয়। সাহাবাদের মর্যাদা রক্ষা করা এবং বিভ্রান্ত ধারণার জবাব দেওয়া ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধ্যায়ে আমরা এই বিভ্রান্ত ধারণাগুলোর প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাখ্যা তুলে ধরব।

বিভ্রান্ত মতামত ও জবাব

বিভ্রান্ত মত ১: সাহাবাগণ রাজনৈতিক সংঘর্ষের সময় নিজেদের স্বার্থে কাজ করেছেন

বাস্তবতা:
ইসলামের ইতিহাসে কিছু যুদ্ধ বা মতভেদ দেখা যায়, যেমন যুদ্ধের পরবর্তী রাজনৈতিক ইজতিহাদ, কিন্তু সাহাবাদের উদ্দেশ্য ছিল সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমার সাহাবাগণ আমার মতো উজ্জ্বল নক্ষত্র; তুমি তাদের যেকোনো একজনকে অনুসরণ করো, তুমি পথভ্রষ্ট হবে না।"
-(ইবনু আব্দিল বার, সিয়ার)

এটি প্রমাণ করে যে, সাহাবাগণ দ্বীনের উদ্দেশ্যকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছেন, ব্যক্তিগত বা রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য কখনো পথভ্রষ্ট হননি।

বিভ্রান্ত মত ২: সাহাবাগণ ভুল করেছেন, তাই অনুসরণ করা যায় না

বাস্তবতা:
মানুষ হিসেবে সাহাবাগণও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ভুল করেছেন, কিন্তু এটি দ্বীনের মূল ভিত্তি বা নবীর নির্দেশের ব্যাখ্যা নষ্ট করে না।
আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করেছেন:

"আর যারা প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছে; মুহাজির ও আনসার এবং যারা উত্তমভাবে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, আর তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।" -(সূরা আত-তাওবা, আয়াত: ১০০)

সহীহ হাদীস ও কুরআনের এই নির্দেশ আমাদের শিখায়, সাহাবাদের ভুল মানবিক মাত্রার অন্তর্গত হলেও তাঁদের মর্যাদা অপরিবর্তনীয়।

বিভ্রান্ত মত ৩: সাহাবাদের মধ্যে কোনো কোনো ব্যক্তি নবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছেন

বাস্তবতা:
কেউ কেউ ইতিহাস থেকে বিভ্রান্ত হয়ে মনে করেন যে, কেউ নবীর নির্দেশনার বিপরীত পথে চলেছেন। কিন্তু সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে দেখা যায়, প্রকৃত সাহাবাগণ নবীর প্রতি সর্বদা আনুগত্যপূর্ণ ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যে আমার সাহাবাদের ভালোবাসে, সে আমাকেও ভালোবাসবে; আর যে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার প্রতিকূল হবে।" -(ইবনু মাজাহ: ৪১০১)

তাই প্রকৃত সাহাবাদের মধ্যে এমন কোনো বিদ্বেষ ছিল না।

বিভ্রান্ত মত ৪: সাহাবাদের মধ্যে দুনিয়াবাদী মনোভাব দেখা গেছে

বাস্তবতা:
কিছু সমালোচক মনে করেন, বিশেষ পরিস্থিতিতে সাহাবাগণ নিজের স্বার্থে কাজ করেছেন। তবে সহীহ হাদীসের আলোকে দেখা যায়, সাহাবারা সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নবীর অনুগত্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগ।"
-(সহীহ বুখারী: ২৬৫২, সহীহ মুসলিম: ২৫৩৩)

এই হাদীস সাহাবাদের সর্বোচ্চ নৈতিক ও ধর্মীয় মর্যাদা প্রমাণ করে।

বিভ্রান্ত মত ৫: সাহাবারা হাদীস সংগ্রহে অনিয়ম করেছেন

বাস্তবতা:
সাহাবাগণ হাদীস সংরক্ষণে প্রথম ও প্রধান রক্ষক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমোদিত, দায়িত্বশীল প্রচেষ্টার মাধ্যমে হাদীস প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সংরক্ষিত হয়েছে।

ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন:

"সাহাবাদের অবদান ছাড়া আমরা নবীর জীবন ও বাণী সম্পর্কে জানতাম না।"
-(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

উপসংহার

সাহাবাদের বিষয়ে বিভ্রান্ত মতগুলো মূলত ইতিহাসের ভুল ব্যাখ্যা বা প্রথাগত বিভ্রান্তি থেকে উদ্ভূত। সহীহ কুরআন এবং হাদীসের আলোকে দেখা যায়, সাহাবাদের ঈমান, ত্যাগ এবং দ্বীনের জন্য নিষ্ঠা অবিচল।

তাই একজন গবেষক বা মুসলিমের দায়িত্ব হলো -

১. সাহাবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা,

২. বিভ্রান্ত ধারণাগুলো সমাধান করা,

৩. এবং পরবর্তী প্রজন্মকে সঠিক শিক্ষার মাধ্যমে সজ্জিত করা।

সপ্তম অধ্যায়: কতিপয় সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী

আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী

হে আল্লাহ! তাকে দান করো সন্তান ও সম্পদ, তার জীবনকে করে দাও বরকতময়।

-প্রিয় নবীর দুআ

আনাস ইবনে মালেক ছিলেন নিষ্পাপ গোলাপের মতো নিশ্চিন্ত বয়সের ছোট্ট এক বালক, যখন তার মা 'গুমাইসা' তাকে শিখিয়েছিলেন কালিমা-ই শাহাদাত। তার হৃদয়ের কোমল পাত্রটিকে তিনি পূর্ণ করে দিয়েছিলেন ইসলামের নবী মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা দিয়ে...

আনাস প্রিয় নবীর ভালোবাসায় পাগলপারা হয়ে পড়েছিল শুনতে শুনতে।

বিস্ময়ের কিছু নেই, দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়া অনেক সময় শুধু শুনে শুনেও প্রেম সৃষ্টি হয় ...

ছোট্ট বালক হৃদয়ে কতবার আকাঙ্ক্ষা জাগল, আহা! যদি আমি মক্কায় ছুটে যেতে পারতাম তাঁর নূরানী চেহারাখানা দেখতে! অথবা যদি তিনি নিজেই চলে আসতেন 'ইয়াসরিবে' আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দিতে!

বালক আনাসের এই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার পর খুব বেশিদিন পার হয়নি, এর মধ্যে 'ইয়াসরিবে' ছড়িয়ে পড়ল এই সুসংবাদ প্রিয় নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক রওনা করেছেন ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে...

এতে প্রতিটি গৃহে বয়ে গেল আনন্দের জোয়ার... প্রতিটি হৃদয় নেচে উঠল খুশির ছোঁয়ায়। সব মানুষের ব্যাকুল হৃদয় আর চঞ্চল চাহনি আটকে রইল সেই মুবারক পথে, যেই পথ ধরে এগিয়ে আসছেন প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সঙ্গী ইয়াসরিব এর দিকে।

এরপর প্রতিদিন প্রভাতে শিশু বালকেরা হৈ চৈ করে গুজব ছড়াত-

'মুহাম্মাদ এসে পড়েছে' 'এসে পড়েছে...'

এই হৈ চৈ শুনে প্রতিদিনই ঘর থেকে ছুটে বেড়িয়ে পড়ত আনাস অন্য শিশুদের সঙ্গে, কিন্তু কাউকেই খুঁজে না পেয়ে চিন্তিত ও বিষন্ন মনে আবার ফিরে আসত ঘরে।

কোনো এক আলোকিত ও উজ্জ্বল প্রভাতে 'ইয়াসরিব' এর বড় বড় পুরুষ মানুষেরা চিৎকার করে জানাল,

'মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গী এসে পড়েছেন মদীনার কাছাকাছি।'

বড় বড় লোকেরা এগিয়ে গেলেন সেই মুবারক পথের দিকে, যে পথ ধরে তাদের কাছে আসছেন হিদায়াত আর কল্যাণের নবী...

তারা দলে দলে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলেন তাঁর উদ্দেশ্যে, যাদের মধ্যে ঢুকে ছিল ছোট ছোট শিশু বালকের দল, যাদের চেহারায় ফুটে উঠছিল শিশু-অন্তর ছাপানো, হৃদয় উপচানো আনন্দ-উল্লাস...

আর সেই সব শিশুর অগ্রভাগে ছিল আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারী।

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এলেন সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-সহ। তাঁরা আগাতে থাকলেন কিশোর বালক আর বড় বড় মানুষের বিশাল দলের মাঝখান দিয়ে...

নারীরা আর ছোট্ট ছোট্ট শিশুরা ছিল ঘর-বাড়ির ছাদগুলিতে, তারা রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক নজর দেখার জন্য ছটফট করে জানতে চায়-

'নবী কোনটা?"

সে ছিল এক অবিস্মরণীয় দিন...

আনাস ইবনে মালেক নিজের শতাধিক বয়সের দীর্ঘজীবন ধরে স্মরণ করেছেন সেই অবিস্মরণীয় দিনটির কথা।

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মদীনায় এখনো স্থির হননি, এরই মধ্যে তাঁর কাছে এলেন আনাসের মা 'গুমাইসা বিনতে মিলহান'। সঙ্গে ছিল তাঁর ছোট্ট বালকপুত্র, মায়ের সম্মুখে লাফালাফি করছিল আর কপালের ওপর ঝুলছিল বেণীর মতো দুটো কেশগুচ্ছ।

গুমাইসা প্রিয় নবীকে সালাম দিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আনসারের প্রতিটি নারী-পুরুষ আপনাকে দিয়েছেন কিছু না কিছু হাদিয়া। কিন্তু আমার কাছে আপনাকে দেওয়ার মতো কিছুই যে নেই এই পুত্রটি ছাড়া! দয়া করে একেই গ্রহণ করুন। আপনার। খেদমতের জন্য একে দিয়ে গেলাম।'

প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিশু বালকটিকে পেয়ে দারুন খুশি হলেন, সে খুশির ঝিলিক দেখা গেল তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়। তিনি বালকটির মাথায় বুলিয়ে দিলেন নিজের পবিত্র হাত, নিজের কোমল আঙ্গুলগুলি দিয়ে স্পর্শ করলেন কপালে ঝুলে থাকা তার কেশগুচ্ছ, তাকে যুক্ত করে নিলেন নিজের পরিবারের মধ্যে।

আনাস ইবনে মালেক অথবা প্রিয় নবীর আদরের 'উনাইস' ছিলেন দশ বছর বয়সের এক বালক, যেদিন তিনি গৃহীত হয়েছিলেন প্রিয় নবীও খেদমতের জন্য।

প্রিয় নবীর ওফাত পর্যন্ত তিনি তাঁরই পাশে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে জীবন কাটিয়েছিলেন।

প্রিয় নবীর একান্ত সাহচর্য লাভ করেন তিনি পূর্ণ দশ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি গ্রহণ করেন প্রিয় নবীর জীবন দর্শন যা দ্বারা তিনি পরিশুদ্ধ করেন নিজের নফসকে।

মুখস্থ করেন তাঁর হাদীস-যা দ্বারা পরিপূর্ণ করেন নিজের অন্তরকে।

জেনে নেন তাঁর জীবনচরিত, তাঁর ভেতর-বাহির এবং তাঁর উত্তম আখলাক যা একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে সমগ্র উম্মত।

আনাস ইবনে মালেক দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেয়েছেন এমন দয়া ও স্নেহের আচরণ, যা কোনো সন্তান পায়নি পিতার নিকট...

তিনি স্বাদ গ্রহণ করেছেন তাঁর উন্নত চরিত্রের এবং মহত্তম স্বভাবের, যার জন্য তিনি জগৎময় হয়ে পড়েছেন ঈর্ষণীয়।

আমরা এখন দয়ার নবীর কোমলতা, উদারতা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের কিছু উজ্জ্বল চিত্র উপস্থাপনের ভার দিচ্ছি খোদ আনাস ইবনে মালেকের ওপর। কারণ এ বিষয়ে তিনিই সর্বাধিক জ্ঞাত আর তাঁর বর্ণনাই হবে সর্বাধিক শক্তিশালী...

আনাস ইবনে মালেক বলেন:

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের, প্রশস্ততম হৃদয়ের এবং পূর্ণতম মমতার অধিকারী...

একদিন তিনি আমাকে একটি কাজে পাঠালেন, আমি সঙ্গে সঙ্গেই বের হলাম কিন্তু তাঁর কাজে না গিয়ে চলে গেলাম বাজারে খেলাধুলায় মত্ত বালকদের সঙ্গে খেলতে। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পর বুঝলাম কেউ একজন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমার জামা ধরে টানছে...

পেছনে ফিরে তাকালাম, চমকে উঠে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। মুখে মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে,

'হে উনাইস। তোমাকে যেখানে যেতে বলেছিলাম সেখানে কি গিয়েছিলে?'

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ... এক্ষুনি যাব ইয়া রাসূলাল্লাহ...।

'আল্লাহর কসম! আমি দশ বছর তাঁর খেদমত করেছি, (এই দীর্ঘ সময়ে) তিনি কখনোই এমন প্রশ্ন করেননি, 'কেন করলে?' কখনোই বলেননি, 'কেন করোনি?'

প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ডাকতেন আনাসকে, তখন নিজের কণ্ঠে সবটুকু স্নেহ-মমতা আর আদর মেখে শিশু বাচ্চার মতো করে বলতেন, ইয়া উনাইস। কখনো বলতেন, ইয়া বুনাইয়া (হে আমার আদরের বেটা!)

তিনি তাকে প্রচুর উপদেশ দিতেন, নসিহত করতেন যেগুলো পূর্ণ করে রাখত তার হৃদয়কে, অধিকার করে থাকত তাঁর জ্ঞানের জগৎকে।

তাঁর একটি উপদেশবাণী ছিল এমন:

'বেটা। তোমার অন্তরে কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই-এমনভাবে যদি সকাল (থেকে সন্ধ্যা) এবং সন্ধ্যা (থেকে সকাল) কাটাতে পারো তাহলে তুমি তাই করো বেটা। মনে রেখো ওটাই আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত জীবিত করল (দৃঢ়তার সঙ্গে আমল করল) নিশ্চিত সে আমাকে সত্যিকারের মুহাব্বত করল...

আর যে আমাকে সত্যিকারের মুহাব্বত করল, সে থাকবে আমার সঙ্গে জান্নাতে...

বেটা। যখন তুমি প্রবেশ করবে তোমার গৃহে, পরিবারের লোকদের সালাম দেবে, তাহলে সেটা তোমার ও তোমার পরিবারের লোকদের জন্য হবে বরকতের কারণ।'

আনাস ইবনে মালেক প্রিয় নবীর ওফাতের পর বেঁচেছিলেন আশি বছরেরও বেশি। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মানুষের অন্তরকে পূর্ণ করে দিয়েছেন ইলমে রাসূল দ্বারা, ভরে দিয়েছিলেন তাদের জ্ঞান-উপলব্ধিকে ফিকহে নববী দ্বারা...

এর মাঝে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন অন্তরসমূহকে, সাহাবী ও তাবেঈদের মাঝে প্রিয় নবীর আদর্শের প্রসার ঘটিয়ে এবং মানুষের মাঝে মহানবীর অমূল্য বাণী ও মহৎ কর্মের প্রচার করে।

আনাস দীর্ঘ জীবনের বিস্তৃত পরিসরে ছিলেন মুসলিমজাতির আশ্রয়স্থল। তারা ছুটে আসত তাঁর কাছে যখনই সৃষ্টি হতো কোনো জটিলতা, ভরসা করত তাঁরই ওপর যখনই তাদের কাছে অস্পষ্ট বোধ হতো কোনো হুকুম।

কেয়ামতের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাউজে কাউসারের পানি পান করাবেন-এর সত্যতা নিয়ে কিছু লোক তর্ক-বিতর্ক করল। এ বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, ভাবতে অবাক লাগে। যে হাউজে কাউসার নিয়ে এমন ঝগড়া-বিবাদ আমাকে দেখতে হচ্ছে। অথচ এমন অনেক অভিজ্ঞ ও বয়স্ক বৃদ্ধ আছেন, যারা প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন, যেন তারা কেয়ামতের ময়দানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজের পানি পান করার তাওফীক লাভ করেন।

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘজীবন কাটিয়েছেন প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করে....

তিনি খুব প্রফুল্য হতেন প্রিয় নবীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্তটি মনে পড়লে। প্রচুর অশ্রু ঝরাতেন তাঁকে হারানো বিষাদময় দিনটি স্মরণ হলে।

তিনি বারবার প্রিয় নবীর কথা বলতেন, বারবার তাঁকে সুস্মরণ করতেন। তিনি নিজের কাজে ও কথায় তাঁরই অনুসরণ করতেন, তিনি তাই পছন্দ করতেন যা ছিল প্রিয় নবীর পছন্দ, তিনি সেটাই অপছন্দ করতেন যা ছিল তাঁর অপছন্দ।

আনাস ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের সেরা স্মরণীয় দিন ছিল দুইটি। একটি ছিল, প্রিয় নবীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের দিন, অন্যটি ছিল তাঁকে চিরতরে হারানোর দিন। যখন মনে পড়ত প্রথম দিনের কথা, তিনি খুবই খুশি হতেন এবং সতেজ হয়ে উঠতেন। আর যখন মনে হতো দ্বিতীয় দিনটির কথা, শোকে কাতর হতেন নিজে এমনভাবে কাঁদতেন যে আশপাশের সকলকেও তাঁর সেই কান্না স্পর্শ করত।

তিনি প্রায়ই বলতেন, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলাম আমাদের মাঝে আগমনের দিন, আবার তাঁর চির বিদায়ের দিন, ঐ দুটো দিনই আমার জীবনে তুলনাহীন।

মদীনাতে তাঁর আগমনের দিনে সবকিছুই ঝলমলে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেদিন তিনি চলে গেলেন আপন প্রভুর সান্নিধ্যে, জগতের সবকিছুই অন্ধকারে ছেয়ে গেল...

তাঁকে সর্বশেষ দেখেছিলাম সোমবার, যখন তাঁর হুজরা থেকে পর্দা সরানো হয়েছিল। সেদিন সকলে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলেন। তারা প্রায় অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, আবু বকর ইঙ্গিতে তাদের স্থির থাকতে বললেন।

সেই দিনেরই শেষ বেলায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমরা যখন তাঁকে দাফন করছিলাম, আমাদের নিকট তাঁর চেহারার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় আর কিছু ছিল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবনে মালেকের জন্য একাধিকবার দুআ করেছেন। তাঁর একটি দুআ ছিল:

'হে আল্লাহ! তাকে দান করো সম্পদ ও সন্তান, আর বরকত দাও তার জীবনে।'

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীর দুআ কবুল করলেন। আনাস হলেন আনসার সাহাবীদের মাঝে সম্পদে ও সন্তানে সর্বাধিক প্রাচুর্যময়; এমনকি তিনি আপন জীবনকালেই দেখেছিলেন শতাধিক সন্তান ও নাতিকে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর জীবনে দিয়েছিলেন এমন বরকত যে তিনি বেঁচেছিলেন পূর্ণ এক শতাব্দীকাল আরও তিন বছর।

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত প্রাপ্তির ব্যাপারে ছিলেন তীব্র আশাবাদী। তিনি প্রায়ই বলতেন,

আমি কিয়ামতের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে হাজির হয়ে বলব, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই যে দেখুন আপনার 'পিচ্চি' খাদেম উনাইস।

আনাস ইবনে মালেক যখন মৃত্যুমুখে উপনীত হলেন, তখন নিজ পরিবারের লোকদের বললেন, তোমরা আমাকে লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর তালকীন করো।

এরপর তিনি ঐ কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করলেন।

তিনি অসিয়ত করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট্ট লাঠি যেন তাঁর সঙ্গে কবরে দাফন করে দেওয়া হয়।

সুতরাং সেটা তাঁর দেহের পাশে কামিসের মধ্যে রেখে দাফন করা হলো।

অভিনন্দন আনাস ইবনে মালেক আল-আনসারীর প্রতি, আল্লাহ তাআলা পূর্ণ করে দিয়েছেন তার প্রতি কল্যাণ।

তিনি মহান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে কাটিয়েছেন পূর্ণ দশ বছর...

তিনি ছিলেন তাঁর হাদীস রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তিত্ব, অন্য দু'জন ছিলেন আবু হুরাইরা এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর...

আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে দান করুন সর্বোত্তম বিনিময় তাঁকে ও তাঁর মা গুমাইসাকে।

তুফাইল ইবনে আমর আদ- দাউসী

হে আল্লাহ! তুমি তাকে দান করো এমন একটি নিশানা যা তাকে কিয়ামতের কল্যাণের কাজে সাহায্য করবে।

— প্রিয় নবীর একটি দুআ—
তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী 'দাউস' গোত্রের জাহেলী যুগের সর্দার। আরবের চিহ্নিত সম্ভ্রান্ত লোকদের অন্যতম। সীমিত পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিবর্গের একজন..

তার ডাক কখনও চুলা থেকে নামত না.., আগন্তুকের সম্মুখে তার দুয়ার কখনো রুদ্ধ হতো না...

খাবার দিতেন ক্ষুধার্তকে, নিরপত্তা দিতেন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে, আশ্রয়প্রার্থীকে দিতেন আশ্রয়। এসবের পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন তীক্ষ্ণ মেধাবী ও বুদ্ধিদীপ্ত সহিত্যিক, সূক্ষ্ম আবেগ ও অনুভূতিজাত কাব্য- প্রতিভার অধিকারী কবি, কোনো বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে মধুময় ও জ্বালাময়ী ভাষণে তিনি এমনই পারঙ্গম যে, তার মুখ থেকে বেরোনো কথা শ্রোতার অন্তরে সৃষ্টি করত যাদুর প্রভাব।

তুফাইল নিজ গোত্রের এলাকা (লোহিত সাগরের নিকটবর্তী আরব উপদ্বীপের সমতলভূমি) ত্যাগ করে তেহামা ত্যাগ করলেন, রওনা করলেন মক্কার উদ্দেশ্যে। সে সময় দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের চাকা ঘুরছিল রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কুফফারে কুরাইশের মাঝে। তারা প্রত্যেকেই সংগ্রহ করতে চাচ্ছিলেন নিজের সাহায্যকারী আর আকর্ষণ করছিলেন নিজ নিজ দলের সমর্থক...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন আপন রবের পথে, হাতিয়ার তাঁর ঈমান-বিশ্বাস, হক-ইনসাফ।

পক্ষান্তরে কাফের কুরাইশীরা তাঁর সেই আহ্বান প্রতিরোধের চেষ্টা চালাচ্ছে সকল প্রকার অস্ত্র দিয়ে, সকল পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। তারা মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে সবরকম উপকরণ ব্যবহার করে। তুফাইল দেখলেন, বিনা প্রস্তুতিতে নিজেকে এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ঝামেলায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়তে...

তিনি তো এই লক্ষ নিয়ে মক্কায় আসেননি। ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ ও কুরাইশের এমন দ্বন্দ্বের কথা তাঁর জানাও ছিল না। এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধকে কেন্দ্র করে তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসীর জীবনে ঘটেছে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। চলুন, সবাই মিলে শুনি সেই বিরল কাহিনী।

তুফাইল বর্ণনা করেন :

'আমি এলাম মক্কায়। দেখামাত্র কুরাইশ নেতৃবৃন্দ ছুটে এল আমার কাছে। আমাকে জানাল উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং স্থান করে দিল আরামদায়ক ও মর্যাদাপূর্ণ মেহমানখানায়।

তাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকেরা সমবেত হলো আমাকে ঘিরে। তারা উদ্বেগের সঙ্গে আমাকে জানাল,

'হে তুফাইল! তুমি তো আমাদের এলাকায় এসেই পড়েছ, এখানে তোমাকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। কারণ, এই যে লোকটি নিজেকে নবী বলে দাবি করে বেড়াচ্ছে, সে দুর্বল করে দিয়েছে আমাদের নেতৃত্ব, বিনষ্ট করে ফেলেছে আমাদের ঐক্য ও সংহতি। বিভক্ত করে দিয়েছে আমাদের সকলকে। আমাদের ভীষণ আশঙ্কা হচ্ছে যে তোমার ওপর এবং স্বজাতির মধ্যে তোমার নেতৃত্বের ওপরও আপতিত হবে সেই বিপদ যা হয়েছে আমাদের ওপর। অতএব, তুমি লোকটির সঙ্গে কোনো কথা বলতে যেয়ো না। কিছুতেই তাঁর কোনো কথা শুনতে যেয়ো না। কারণ, সে এমন কিছু কথা বলে থাকে যা যাদুমন্ত্রের মতো দ্রুত অন্তরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সে কথা পিতা-পুত্রের মাঝে, ভাইয়ে ভাইয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদের দুর্ভেদ্য দেয়াল খাড়া করে দেয়।'

তুফাইল কাহিনীর পরবর্তী অংশের বর্ণনায় বলেন

'আল্লাহর কসম! এভাবেই তারা আমাকে শোনাতে থাকল তাঁর চমকে দেওয়া ঘটনাবলী এবং আমাকে আতঙ্কিত করতে থাকল নিজের প্রতি ও নিজ কওমের প্রতি তাঁর ভীতি জাগানো কর্ম-কাণ্ডের বিবরণ দ্বারা। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম, আমি তাঁর ধারে কাছেই যাব না, তাঁর সঙ্গে কোনো কথাই বলব না এবং শুনবও না তাঁর কোনো কথা।

আমি যখন কাবা-তাওয়াফের উদ্দেশ্যে এবং আমাদের পূজনীয় দেব-দেবীর বরকত লাভের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন দুই কানে তুলা ভরে নিলাম যেন মুহাম্মাদের কোনো কথা আমার কানে ঢুকে না পড়ে।

কিন্তু যেইমাত্র আমি কাবা-প্রাঙ্গনে প্রবেশ করলাম, প্রথমেই আমার চোখে পড়ল কাবার নিকট দাঁড়িয়ে মুহাম্মাদের নামায পড়ার অপূর্ব দৃশ্য। তিনি নামায পড়ছেন-সেটা আমাদের মতো

নয়। তিনি ইবাদত করছেন-আমাদের ইবাদতের মতো নয়। তাঁর নামাযের দৃশ্যে আমি থমকে গেলাম। তাঁর ইবাদত একেবারে ওলট-পালট করে দিল আমার সব পূর্ব-পরিকল্পনা। জানি না, কেমন করে যেন একটু একটু করে আমি তাঁর দিকে এগুতে থাকলাম, তাঁর একেবারে নিকটে পৌঁছে গেলাম... আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর তেলাওয়াতের কিছু অংশ আমার কানে এল। আমি শুনতে পেলাম অসম্ভব সুন্দর, ভারি চমৎকার কিছু কথা। তখন আমি নিজেকে তিরস্কার করে মনে মনে বললাম,

হায়রে হতভাগা তুফাইল! এত বড় পোড়া কপাল তোর! তুই একজন বিচক্ষণ কবি। ভালো-মন্দের পার্থক্য জ্ঞান তো তোর আছে। তাহলে লোকটির কিছু কথা শুনতে তোর বাধা কোথায়? তার বক্তব্য ভালো হলে গ্রহণ করবি, আর মন্দ হলে ত্যাগ করবি!' ?

তুফাইল বলেন:

'এরপর আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত শেষ করে আপন গৃহে রওনা হলেন। আমি তাঁর পিছু নিলাম। তিনি যখন নিজগৃহে প্রবেশ করলেন সেখানেই আমি তাঁর মুখোমুখি হলাম এবং তাঁকে বললাম-

'হে মুহাম্মাদ! আপনার কওমের লোকেরা আমাকে আপনার সম্পর্কে একগাদা সতর্কবাণী দিয়েছে। আপনার ব্যাপারে তারা আমাকে এত আতঙ্কিত করে তুলেছিল যে, শেষ পর্যন্ত আমি তুলা দিয়ে দুই কান বন্ধ করে এসেছিলাম যেন আপনার কোনো কথা আমার কানে ঢুকতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে আমাকে শুনিয়েছেন কিছু কথা, আহা! কী অপূর্ব সেই বাণী। ... যার আকর্ষণে আপনার পিছু পিছু আমি এখানে হাজির হয়েছি। দয়া করে আপনার বক্তব্য ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আমার কাছে খুলে বলুন...'

তিনি আমার কাছে তাওহীদ ও রিসালাতের ব্যাখ্যা দিলেন। পাঠ করে শোনালেন সূরা ইখলাস ও সূরা ফালাক। আল্লাহর কসম! এরচেয়ে উত্তম কোনো বাণী সারাজীবনেও আমি শুনিনি। এত বাস্তবধর্মী, যুক্তি ও ইনসাফপূর্ণ দীন আমি আর দেখিনি... সুতরাং আর কিসের বিলম্ব? তাঁর সামনে বাড়িয়ে দিলাম সমর্পণের হাত, পড়ে নিলাম তাওহীদ ও রিসালাতের ঘোষণা-সম্বলিত ঈমানের দৃপ্ত শপথের বাণী...

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং এটাও যে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

এবং এভাবে আমি দীক্ষিত হলাম ইসলামে।'

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

'এরপর কিছুকাল আমি অবস্থান করলাম মক্কায়, শিখে নিলাম ইসলামের শিক্ষাগুলো। সাধ্যমতো মুখস্থ করে নিলাম কুরআনের কিছু অংশ। যখন স্বগোত্রে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললাম, তখন প্রিয় নবীর নিকট গিয়ে বললাম-

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজ গোত্রে একজন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব, আজ তাদের কাছে ফিরে যাব এবং আমি তাদের ইসলামের দিকে আহ্বান করব। আপনি দয়া করে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে দান করেন কোনো নিশানা-যা হবে এই দাওয়াতি কাজে আমার সহায়ক।

তিনি বললেন:

'হে আল্লাহ! তুমি তাকে দান করো কোনো নিশানা।'

এরপর আমি বের হলাম আমার কত্তমের উদ্দেশ্যে। যখন আমি তাদের এলাকার কাছাকাছি একটি উঁচু স্থানে পৌঁছি তখনই আমার দু'চোখের মাঝখানে প্রকাশ পেল বাতির মতো উজ্জ্বল আলো। আমি প্রার্থনা করলাম-

'হে আল্লাহ! দয়া করে এই আলো আমার মুখমণ্ডল থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর করে দাও! কারণ আমি আশঙ্কা করছি, তারা বলবে আমার কপালে আগুন জ্বলছে-তাদের ধর্ম ত্যাগের কারণে আমার জন্য এই শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে। সেই অলৌকিক আলো স্থানান্তরিত হলো আমার চাবুকের মাথায়। লোকেরা আমার চাবুকের মাথায় ঝুলন্ত প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল সেই নূরের দিকে তাকাতাকি করতে লাগল। তখন আমি পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নামছিলাম। যখন নিচে পৌঁছলাম, আমার কাছে এগিয়ে এলেন আমার পিতা-তিনি ছিলেন এক অতিবৃদ্ধ মানুষ। আমি তাকে বললাম,

'বাবা! তুমি আমার কাছ থেকে দূরে থাক। কারণ আমি তোমার কেউ নই, তুমিও আমার কেউ নও।'

'কেন রে ব্যাটা?...'

'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, মুহাম্মাদের দীনের অনুসারী হয়ে গেছি।'

'ব্যাটা, তুমি যে দীন গ্রহণ করেছ, আমিও সেটা গ্রহণ করলাম।'

'তাহলে তুমি গোসল করে পবিত্র হও, পবিত্র পোশাক পরে এসো। তোমাকে শিখিয়ে দেই সেই বিষয় যা শেখানো হয়েছে আমাকে।

তিনি যথারীতি গেলেন, গোসল করলেন এবং পবিত্র পোশাক পরে এলেন। তখন আমি তার কাছে ইসলামের বাণী তুলে ধরলাম। তিনি সানন্দে ইসলাম কবুল করে নিলেন।

এরপর এল আমার স্ত্রী। আমি বললাম, 'একটু দূরত্ব বজায়ে রাখো। কারণ, এখন আর তোমার-আমার মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী কারণে এমন হলো? আমার পিতা-মাতা তোমার জন্য উৎসর্গিত। এই বিচ্ছেদের কারণটা কি জানতে পারি?'

আমি বললাম, 'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, দীনে মুহাম্মাদের অনুসারী হয়েছি। ইসলাম কোনো মুসলিম-পুরুষকে মুশরিক-স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় না। ইসলাম তোমার আমার সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিয়েছে।'

সে বলল, 'তাহলে তোমার দীন ইসলামকেই আমি আমার দীন হিসাবে মেনে নিলাম।'

আমি বললাম, 'তাহলে এক্ষুণি যাও, ঐ যীশশারা (দাউসের দেবী মন্দির) পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী ঝরনার নির্মল পানিতে গোসল করে পবিত্র হয়ে এসো।'

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত তোমার জন্য। তুমি কী দেবী 'যীশশারা দিক থেকে শিশুদের কোনো ক্ষতির আশঙ্কা করছ? সে কারণেই কি সেখানে গোসলের জন্য পাঠাচ্ছ?'

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম, 'চুলোয় যাক তোর দেবী 'যীশশারা', চুলোয় যাক তোর শেরেকী চিন্তা-ভাবনা... আমি সেখানে গিয়ে গোসল করতে বলেছি-সেটা লোকালয় থেকে দূরে, লোকচক্ষুর আড়ালে বলে। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এই বধির পাথুরে মূর্তির ভালো-মন্দ কিছুই করার ক্ষমতা নেই।'

সে গেল। গোসল করে আমার সম্মুখে এসে হাজির হলো। আমি তার কাছে ইসলাম তুলে ধরলাম, সে কবুল করে নিল।

এরপর আমি দাওয়াত পেশ করলাম 'দাউস' গোত্রের সামনে। একমাত্র আবু হুরাইরা ছাড়া সকলেই সে দাওয়াতে সাড়া দিতে বিলম্ব করল।

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

'আমি মক্কায় এলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবু হুরাইরাকে সঙ্গে নিয়ে।'

তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে তুফাইল, তোমার কওমের অন্যদের কী অবস্থা?'

আমি হতাশার সুরে বললাম,

'তাদের অন্তরগুলো তীব্র কুফরীর আবরণে আচ্ছাদিত... তাদের মধ্যে বিরাজ করছে প্রবল পাপাচার আর অবাধ্যতা।'

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে পড়লেন, ওযু করে এসে নামায পড়লেন। এরপর তাঁর মুবারক হাত উঁচু করলেন আকাশের দিকে...

আবু হুরাইরা বলেন, 'আমি এইসব দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম, হয়তো তিনি আমার কওমের বিরুদ্ধে বদ-দুআ করবেন আর তারা ধ্বংস হয়ে যাবে... আমি মনে মনে বললাম, হায়রে আমার কপাল পোড়া জাতি!... কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতে শুরু করলেন,

اللَّهُمَّ أَهْدِ دَوْسًا ... اللَّهُمَّ أَهْدِ دَوْسًا ... اللَّهُمَّ أَهْدِ دَوْسًا

হে আল্লাহ! তুমি দয়া করে দাউস গোত্রের লোকদের হেদায়াত দাও, হেদায়াত দাও, হেদায়াত দাও।

এরপর তিনি তুফাইলের প্রতি ঘুরলেন এবং বললেন,

'তোমার কওমের কাছে ফিরে যাও, তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করবে আর নম্র ভাষায় ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে।'

***

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

'আমি অব্যাহতভাবে দাউস জনগোষ্ঠীকে ইসলামের দিকে ডাকতে থাকলাম। ইতোমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হিজরত করে মদীনায় চলে গেলেন। পেরিয়ে গেল আরও বহু সময়। ঘটে গেল বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধ। এরপর আমি হাজির হলাম প্রিয় নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] খেদমতে। এবার আমার সঙ্গে হাজির হলো দাউস গোত্রের আশিটি পরিবার; যারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে খাঁটি মুসলিমের পরিচয় দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ভারি খুশি হলেন। আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ ছাড়াই মুজাহিদদের সঙ্গে আমাদেরকেও খায়বর যুদ্ধের গনিমত প্রদান করলেন। আমরা তখন বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! পরবর্তী প্রতিটি জিহাদে আমাদেরকে আপনার ডান দিকের সৈনিক হিসাবে নির্ধারণ করুন আর 'মাবরুর' শব্দটি আমাদের সংকেত হিসাবে নির্ধারণ করুন।'

তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

'এরপর আমি মক্কা বিজয় পর্যন্ত রয়ে গেলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। পরে আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমার এলাকার আমর ইবনে হামামা'র দেবী 'যুল-কাফফাইন'কে জ্বালিয়ে ধ্বংস করার অনুমতি প্রদান করুন...'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলে তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ কওমের ছোট্ট একটি বাহিনী নিয়ে রওনা হলেন সেই দেবী মূর্তির উদ্দেশ্যে যখন সেখানে পৌঁছে গেলেন এবং মূর্তির গায়ে আগুন ধরানোর আয়োজন করলেন, তখন তার আশ-পাশে বহু নারী-পুরুষ আর শিশু দর্শক জমে গেল। তারা সকলেই অপেক্ষা করছিল কখন তার ওপর বিপদ নামবে। তারা নিশ্চিত ছিল যে, দেবী 'যুল-কাফফাইনে'র সঙ্গে বেয়াদবি করলে অবশ্যই বজ্রপাতে তার মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু নির্ভিক গতিতে এগিয়ে গেলেন, মূর্তিটির সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং একদল অন্ধ-ভক্ত পূজারীর বিস্ময়ভরা দৃষ্টির সামনে দেবীর গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন আর ছন্দে-ছড়ায় গাইতে লাগলেন,

يَاذَا الْكَفَّيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَادِكَا مِيْلَادُنَا أَقْدَمُ مِنْ مِيْلَادِكَا إِنِّي حَشَوْتُ النَّارَ فِي فُؤَادِكَا

রে যুল-কাফফাইন, ফুরালো তোর দিন, তোর পূজা করি না, জানি তুই শক্তিহীন। জন্মেছি আগে তোর জন্মের, রাখব না কোনো পথ শিরকের। জ্বালিয়ে দিলাম তোর আস্তানা গায়রুল্লাহর পূজা চলবে না।

আগুন জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে, সে আগুন দেবী মূর্তিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিল। এরই সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল দাউস গোত্রে মূর্তিপূজা ও শিরকের শেষ চিহ্নটুকুও। এরপর সেখানের নারী-পুরুষ সকলেই ইসলাম গ্রহণ করল এবং সেই ইসলাম গ্রহণ নিখুঁত ও নিখাদ প্রমাণিত হলো।

***

এরপর তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী রাযিয়াল্লাহু আনহু আঁকড়ে ধরলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংশ্রব এবং এই ধারা চলতেই থাকল প্রিয় নবীর ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত। তাঁর পরে খেলাফতের দায়িত্ব যখন আরোপিত হলো তাঁরই ঘনিষ্ঠতম সাহাবী আবু বকর সিদ্দীকের প্রতি, তখন তুফাইল রাযিয়াল্লাহু আনহু নিয়োজিত করলেন নিজেকে, নিজের সন্তান ও তরবারিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফার আনুগত্যে।

রিদ্দতের যুদ্ধ যখন শুরু হলো মুসাইলামাতুল কাযযাবের বিরুদ্ধে।

মুসলিমসৈনিকদের শীর্ষস্থানীয় হিসাবে বের হলেন তুফাইল এবং তাঁর পুত্র আমর... ইয়ামামার এই সফরে তিনি এক স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখে তিনি সাথীদের ডেকে বললেন,

'আমি এক স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা এর তাবির (ব্যাখ্যা) বলো।'

তারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী দেখেছেন?'

তিনি বললেন, 'দেখলাম আমার মাথা মুণ্ডন করা হয়েছে, একটি পাখি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল আর এক মহিলা আমাকে তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। আমার পুত্র আমর নিরন্তর চেষ্টা করতে লাগল আমাকে উদ্ধারের, কিন্তু তার ও আমার মাঝে (দেয়ালের মতো) আড়াল তৈরি হয়ে গেল।'

তারা বললেন, 'ভালো স্বপ্ন দেখেছেন...'

তখন তিনি বললেন, 'আমি এর যে ব্যাখ্যা বুঝেছি, তা হলো:

আমার মাথা মুণ্ডন করা-এর মানে তা কর্তিত হবে... অর্থাৎ আমি শহীদ হয়ে যাব। আর যে পাখিটিকে দেখেছি আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, সেটা আমার রূহ... আর যে মহিলা আমাকে নিজের পেটে ঢুকিয়ে নিল, সেটা সেই জমিন যা আমার জন্য খনন করা হবে এবং তার পেটের মধ্যে আমাকে দাফন করা হবে... আমি আশাবাদী যে, আমার শাহাদাতের মৃত্যু হবে ইনশাআল্লাহ...

আর আমার পেছনে পুত্রের নিরন্তর প্রচেষ্টার অর্থ, আমি আল্লাহর ইচ্ছায় যে শাহাদাত খুব শিগগির পেয়ে যাচ্ছি, সেই শাহাদাতের জন্য তারও অবিরাম চেষ্টা থাকবে, কিন্তু সে তা পাবে পরবর্তী কোনো জিহাদে। (এই যুদ্ধে সে শহীদ হতে পারবে না)' ইয়ামামার জিহাদের ময়দানে বিখ্যাত সাহাবী তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসী রাযিয়াল্লাহু আনহু শত্রুর বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর লড়াই করলেন, বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে এক সময় তাঁর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

ওদিকে তাঁর পুত্র আমর শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপন লড়াই করতে থাকলেন, এক সময় শত্রুর আঘাতে তার ডান হাতের তালু কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তিনি শক্তিহীন-দুর্বল হয়ে পড়লেন। ফলে তিনি ইয়ামামার প্রান্তরে শহীদ পিতা আর নিজের শহীদ হাত ফেলে মদীনায় ফিরে এলেন।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন আমর ইবনে তুফাইল। সেদিন খলীফার দরবারে আরও অনেক রাষ্ট্রীয় মেহমান হাজির ছিলেন। সকলের জন্য খাবার আনা হলে খলীফা সবাইকে দস্তরখানে আমন্ত্রণ জানালেন। আমর ইবনে তুফাইল খাবার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন,

'কেন? কী হয়েছে তোমার? তুমি সম্ভবত তোমার হাতের কারণে লজ্জায় খাবারে শরিক হতে চাচ্ছ না'

তিনি জবাব দিলেন, 'আমীরুল মুমিনীন ঠিকই বুঝেছেন।'

খলীফা বললেন,

وَاللَّهِ لَا أَذُوْقُ هُذَا الطَّعَامَ حَتَّى تُخَلِّطَه بِيَدِكَ الْمَقْطُوعَةِ ... وَاللَّهِ مَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ بَعْضُهُ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْت- َ

'আল্লাহর কসম! এই খাবার আমি কিছুতেই মুখে দেব না, যতক্ষণ না তুমি এতে তোমার কাটা হাতের ছোঁয়া লাগাবে। এই মজলিসে তুমি ছাড়া এমন আর একজন মানুষও নেই, যার একটি অঙ্গ ইতিমধ্যেই জান্নাতে পৌঁছে গেছে।'

পিতাকে হারানোর পর থেকে আমর ইবনে তুফাইলের চোখে অবিরাম জ্বলতে থাকে শাহাদাতের স্বপ্ন। তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন শহীদ হওয়ার জন্য। অবশেষে ইয়ারমুকের যুদ্ধ যখন সংঘটিত হলো, (তখনকার অন্যতম সেরা শক্তিশালী রোমসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পনেরো হিজরীতে সংঘটিত ইতিহাসের বিখ্যাত যুদ্ধের নাম ইয়ারমুক। যেখানে মুসলিমবাহিনী লাভ করেছিল বিশাল বিজয়।) আমর সেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন সর্বাগ্রে। বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে একসময় তিনি সেই শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করলেন, যার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর পিতা।

***

আল্লাহ তাআলা তুফাইল ইবনে আমর আদ-দাউসীর প্রতি বর্ষণ করুন রহমতের বৃষ্টিধারা। তিনি নিজেও আল্লাহর পথে জীবন দানকারী শহীদ এবং শহীদ পুত্রের পিতাও।

সালমান আল-ফারসী

ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রের জগতে থাকত, তবে এর মতো লোকেরা সেখান থেকেও তা হাসিল করে ছাড়ত।

-সালমানের কাঁধে হাত রেখে প্রিয় নবীর উক্তি।

এ কাহিনী এমন একজন মানুষের-যিনি মহাসত্যের সন্ধানে, প্রকৃত দীন ও সর্বশেষ নবীর খোঁজে অবিরাম ছুটেছেন একস্থান থেকে অন্যস্থানে। যিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ভীষণ ব্যাকুলতা বুকে নিয়ে খুঁজে বেড়িয়েছেন মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের সরল ও সোজা পথ। এ কাহিনী সালমান আল-ফারসীর শ্বাসরুদ্ধকর জীবন যুদ্ধের। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন।

আমরা তাঁর ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি নিজ জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতময় এই কাহিনী তিনি নিজেই বর্ণনা করুন। এ বিষয়ে তাঁর অনুভূতিই হবে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী এবং তাঁর বর্ণনাই হবে সর্বাধিক সত্যাশ্রয়ী।

সালমান আল-ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহু আপন কাহিনীর সূচনায় বলেন:

'আমি ছিলাম এক পারস্য তরুণ। মধ্য ইরানের ইস্পাহান নগরীতে 'জাইয়্যান' গ্রামে ছিল আমার বাস। আমার পিতা ছিলেন সেই গ্রামের সবচেয়ে বড় ধনী, সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী। তিনিই ছিলেন সেখানের প্রধান ব্যক্তি। সম্মান ও নেতৃত্বের সর্বোচ্চ আসনটি ছিল তারই দখলে। আমার যেদিন জন্ম হয়, সেদিন থেকেই তিনি আমাকে ভালোবাসতে থাকেন পাগলের মতো। তার এই ভালোবাসা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তেই থাকে। এমনকি এক সময় কাল্পনিক বিপদ-আপদের আশঙ্কায় কুমারী তরুনীদের মতো আমার জন্য বাড়ির বাহিরে বের হওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন।

বাপ-দাদার ধর্মের অনুসারী হিসাবে 'অগ্নি উপাসনা'র ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে আমি প্রচুর সাধনা ও পরিশ্রম করি। সেই ধর্মের বিধি-বিধান আগ্রহের সঙ্গে মেনে চলায় চারদিকে আমার প্রচুর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং উন্নতির ধারাবাহিকতায় এক সময় উপাসনালয়ের প্রধান হিসাবে পূজার অগ্নি দিন-রাত প্রজ্জলিত রাখা, এক মুহূর্তের জন্যও নিভতে না দেওয়ার গুরুদায়িত্ব আমার কাঁধেই ন্যস্ত করা হয়।

আমার পিতার ছিল বিশাল ভূ-সম্পত্তি-যা থেকে আমরা প্রচুর ফসল পেতাম। সেই ফসল ও জমিনের দেখা-শোনা ও ব্যবস্থাপনার সকল কাজ তিনি নিজে নিজেই করতেন।

একবার জরুরি এক ব্যস্ততার কারণে পিতার পক্ষে ফসলের ক্ষেতে যাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না দেখে তিনি আমাকে বললেন, 'বেটা! দেখতেই পাচ্ছ ব্যস্ততার কারণে আজ আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না। সুতরাং তুমিই আজ কাজটি সেরে এসো।' তার নির্দেশনা মতো আমি ক্ষেত-খামার দেখা-শোনার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হলাম। কিছুদূর পথ চলার পর সামনে পড়ল খ্রিস্টানদের একটি গির্জা। সেখানে তখন তাদের নামায ও প্রার্থনা চলছিল। সেই আওয়াজ আমার কানে আসতেই আমি ভীষণভাবে সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম।

***

দীর্ঘকাল যেহেতু পিতার স্নেহবন্ধন আমাকে বাড়ির চার দেয়ালের মাঝে এমনভাবে বেঁধে রেখেছিল যে, খ্রিস্টানদের ব্যাপারে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, নামায ও প্রার্থনার কোনো কিছুই আমার জানা ছিল না। জানতাম না অন্য কোনো ধর্মের কথাও। তাই তাদের প্রার্থনার আওয়াজ শুনতেই আমি ঢুকে পরলাম সেখানে-তারা কী করছে দেখতে।

আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে বুঝতে পারলাম, তাদের নামায ও প্রার্থনার ভঙ্গি আমার মনে ভীষণ দাগ কেটেছে এবং তাদের ধর্মের প্রতি জন্ম নিয়েছে আমার গভীর অনুরাগ ও প্রীতি। আমি মনে মনে বললাম,

'তাদের ধর্ম আমাদের ধর্মের চেয়ে ভালো।' ঐ মুগ্ধতা নিয়ে তাদের মাঝেই আমার সারাটা দিন কেটে গেল। দিন শেষ হয়ে গেল কিন্তু ফসলের ক্ষেতে আমার আর যাওয়া হলো না। আমার ভেতরের চিন্তা-ভাবনার বদল হতে থাকল। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম,

'এই ধর্মের মূল কেন্দ্র কোথায়?'

তারা বলল, 'সিরিয়ায়।'

রাত ঘনিয়ে এলে এখান থেকে আমি সরাসরি বাড়ি ফিরে গেলাম। বাবা আমার কাছে এসে জানতে চাইলেন, 'ফসলের কী অবস্থা? কর্মচারীরা সবাই ঠিকঠাক কাজ করছিল কিনা?'

আমি বললাম,

'বাবা! আমি ক্ষেতের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলাম। যাওয়ার পথে কিছু মানুষকে গির্জায় উপাসনা করতে দেখে সেখানে প্রবেশ করেছিলাম, তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দেখে-শুনে আমি এতটাই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম-সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমি তাদের মাঝেই আটকে ছিলাম, ফসলের জমিন দেখতে যাওয়ার কোনো সুযোগই হয়নি।'

আমার এসব কৃতকর্মের কথা শুনে বাবা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং বললেন:

'বেটা! হঠাৎ জেনেছ বলে ঐ ধর্মের প্রতি তুমি একটু বেশিই মুগ্ধ হয়ে পড়েছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ ধর্মের মধ্যে মুগ্ধ হয়ে যাওয়ার মতো কিছু নেই। আর আসল সত্য এটাই যে তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষের ধর্ম ওটার চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ।'

আমি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বাবার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বললাম,

'তোমার কথা একেবারেই অবাস্তব বাবা! আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আমাদের ধর্মের (অগ্নিপুজার) চেয়ে অনেক অনেক ভালো।' আমার এই কথায় পিতা ভয়ে মুষড়ে গেলেন এবং আমার ব্যাপারে 'ধর্মদ্রোহী' হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় দু'পায়ে বেড়ি পরিয়ে আমাকে ঘরে বন্দী করে রাখলেন।

***

এরপর সুযোগ পাওয়া মাত্রই আমি খ্রিস্টানদের কাছে সংবাদ পাঠালাম,

'সিরিয়াগামী কোনো কাফেলা এলে দয়া করে আমাকে সংবাদ দিও।'

সৌভাগ্যক্রমে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সিরিয়াগামী একটি কাফেলা তাদের কাছে এলে তারা অবিলম্বে আমাকে সংবাদটি জানাল। বহু কষ্ট ও সাধনা করে আমি বেড়িমুক্ত হলাম। গোপনে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অবিরাম সফর করে একদিন সিরিয়ায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে পৌছার পর আমি লোকজনের কাছে জানতে চাইলাম,

'খ্রিস্টধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বর্তমানে কে?'

তারা জানাল, 'গির্জার দায়িত্বে নিয়োজিত বর্তমান বিশপই খ্রিস্টধর্মের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।'

আমি তার কাছে হাজির হয়ে নিবেদন করলাম,

'আমি খ্রিস্টধর্মের আকর্ষণে বহুদূর থেকে এখানে ছুটে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি আপনার সার্বক্ষণিক শিষ্য হতে চাই। আপনার খেদমত করে আপনার নিকট থেকে এই ধর্মের শিক্ষা অর্জন করতে চাই। আমি চাই আপনার সঙ্গে প্রার্থনা করতে এবং আপনার সঙ্গে নামায পড়তে।

আমাকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। আমি তার সার্বক্ষণিক সেবক হয়ে গেলাম। এরপর অল্পদিনের মধ্যেই আমি বুঝে গেলাম, জীবন, কর্ম এবং স্বভাব-চরিত্রের বিচারে এই বিশপ ভালো মানুষ নন। কারণ, লোকটি নিজের অনুসারীদের দান-খয়রাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন,

তাদের শোনান সওয়াবের সুসংবাদ। কিন্তু ভক্ত-অনুরাগীরা যখন তার হাতে নিজেদের দান-খয়রাতের অর্থ-সম্পদ তুলে দেয় গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য, তিনি সেগুলো গরিব-দুঃখীদের না দিয়ে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন। এভাবে মানুষের দান-খয়রাতের সোনা-রুপা দিয়ে তিনি বড় বড় সাতটি কলস পূর্ণ করে ফেলেছেন। তার এ সকল অপকীর্তি দেখে আমার অন্তরের সকল শ্রদ্ধা ক্রোধ ও ঘৃণায় পরিণত হলো। যখন তার ইন্তেকাল হলো এবং তার দাফন-কাফনের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টধর্মীয় বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সমবেত হলেন, আমি তাদের বললাম,

'আপনাদের এই পাদ্রি ছিলেন পুরোদস্তুর একজন ভণ্ড ও প্রতারক। তিনি আপনাদের দান-খয়রাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন কিন্তু আপনাদের দানের অর্থ-কড়ি সম্পূর্ণটাই তিনি আত্মসাৎ করে নিজের জন্য রেখে দিতেন। একটি পয়সাও গরিব-দুঃখীদের দিতেন না।'

তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এসব জানলে কিভাবে?'

তাদের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি বললাম,

'আপনারা চাইলে আমি তার সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার আপনাদের দেখাতে পারি।'

তারা বললেন, 'ঠিক আছে, সেটাই করো।'

একথা শুনে আমি তার সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার সকলকে দেখিয়ে দিলাম। তারা সেখান থেকে বড় বড় সেই সাতটি কলস বের করে আনলেন—যা ছিল সোনা-রূপায় ভর্তি। এসব দেখে-শুনে তারা ঐ পাদ্রির ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর আল্লাহর নামে শপথ নিয়ে বললেন,'আমরা তাকে দাফন করব না।'

এরপর তার মৃতদেহ শূলে চড়িয়ে পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকলেন।

এর অল্পদিন পরেই তারা নতুন একজন পাদ্রিকে তার স্থানে নিয়োগ করলেন। আমি তার সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম। আমি দেখলাম, এই নতুন পাদ্রি দিন-রাত ইবাদতে মগ্ন হয়ে থাকেন। দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই তার লোভ নেই, মোহ নেই। আখেরাতের ব্যাপারে তিনি অতি আগ্রহী। এত ভালো ও খাঁটি ধর্মপ্রাণ মানুষ আমি সারাজীবনে আর একটিও দেখিনি।

ফলে আমি মন-প্রাণ উজাড় করে তাকে সীমাহীন ভালোবেসে তার সেবা করতে থাকলাম। একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় তার সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য আমার হলো। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল আমি তার কাছে নিবেদন করলাম,

'জনাব! আপনার ইন্তেকালের পর আমি কার কাছে যাব, কার সাহচর্য অবলম্বন করব? এ ব্যাপারে আমি আপনার উপদেশ ও পরামর্শ চাই।'

তিনি বললেন,

'বেটা! খ্রিস্টধর্মের যে মৌলিক নীতি-আদর্শের ওপর আমি প্রতিষ্ঠিত ছিলাম, 'মাওছেল'-এর এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ সে রকম আছে বলে আমার জানা নেই। তিনিও আমার মতো ধর্মের কোনো বিকৃতি ঘটাননি, সুতরাং তুমি তার কাছে চলে যেও।'

এই পাদ্রির ইন্তেকাল হয়ে গেলে আমি তার নির্দেশনা মতে মাওছেলের লোকটির নিকট চলে গেলাম। তাকে আমার বিষয়ে সকল তথ্য জানিয়ে বললাম,

'মৃত্যুর পূর্বক্ষণে একজন পাদ্রি আমাকে উপদেশ দিয়ে গেছেন আপনার সাহচর্য অবলম্বন করতে। তিনি আমাকে বলেছিলেন, তার মতো আপনিও প্রকৃত খিস্টধর্ম আঁকড়ে ধরে আছেন।'

সবকথা শুনে তিনি আমাকে নিজের সাহচর্যে কবুল করলেন। ধীরে ধীরে আমি বুঝতে পারলাম তিনি অতি উত্তম একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ।

তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। আমি তার কাছে আবেদন করলাম,

'হে মহান ব্যক্তি! আপনার সামনে আল্লাহ তাআলার অনিবার্য হুকুম (মৃত্যু) এসে গেছে যা আপনি বুঝতে পারছেন। আমার সম্পর্কে তো আপনার সবই জানা। এখন আমি কার কাছে যাব, সে বিষয়ে আমি আপনার সুপরামর্শ ও নির্দেশনা চাই।'

তিনি স্নেহশীল পিতার মতো বললেন,

'হে পুত্র! 'নাছিবাইন'-এর এক ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ আমাদের মতো দীনের ওপর সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং তুমি সেখানে চলে যেও এবং তার কাছে থেকো।'

তার কাফন-দাফনের পর আমি নাছিবাইনের সেই বুযুর্গ মানুষটির নিকট হাজির হলাম, তাকে নিজের পূর্ববর্তী সকল অবস্থা, বিশেষভাবে মুর্শিদের নির্দেশনা সম্পর্কে সবকথা জানালাম। সবশুনে তিনি আমাকে নিজের কাছে থাকার অনুমতি দিলেন। আমি তার সান্নিধ্যে থেকে গেলাম। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম যে, পূর্বের দু'জনের মতো এই বুযুর্গও খুবই সৎ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। তবে তার কাছ থেকে আমি খুব বেশি উপকৃত হতে পারলাম না। অল্পদিনের মধ্যেই তারও মৃত্যুর সময় এসে গেল। তখন আমি তার নিকট গিয়ে বললাম,

'আমার সম্পর্কে আপনার তো সবই জানা আছে আমার লক্ষ্য কী? কিসের জন্য আমি ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছি এখান থেকে ওখানে? সুতরাং আপনার মৃত্যুর পরে আমি কার কাছে যাব, এ বিষয়ে কিছু বলে যান।'

আমার নিবেদন শুনে তিনি দরদভরা কণ্ঠে বললেন,

'বেটা! 'আম্মুরিয়া'র এক বুযুর্গ ছাড়া আর কেউ আমাদের মতো সত্যকে আঁকড়ে ধরে আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি সেই লোকটির নাম উল্লেখ করে বললেন, আমার মৃত্যুর পর তুমি তার কাছে চলে যেও।'

তার পরামর্শ মতো আমি আম্মুরিয়াতে পৌঁছে গেলাম। আমার সকল খবর তাকে খুলে বললাম এবং পূর্বের বুযুর্গের অন্তিম অসিয়তের কথা জানিয়ে আমাকে তার কাছে থাকার অনুমুতি দেওয়ার আবেদন করলাম।

তিনি অনুমতি প্রদান করলেন এবং আমি তার সঙ্গে থাকা শুরু করলাম। দেখলাম পূর্বের দেখে আসা বুযুর্গদের মতো ইনিও নীতি-আদর্শে অবিচল আর খুবই ধর্মপ্রাণ ও মহৎ মানুষ। আমি তার ধর্মভীরুতা, নীতি ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা উপকৃত হতে থাকলাম। তার কাছে থাকাকালীন আমি কয়েকটি গাভী ও বেশ কিছু বকরীর মালিক হয়ে গেলাম। এরপর পূর্ববর্তীদের মতো

একসময় তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এল। যথারীতি অন্তিম মুহূর্তে আমি তার নিকট গিয়ে বললাম,

'আমার পূর্বের সকল খবরই আপনি জানেন। এবার আমি কার কাছে যাব? কী করব? দয়া করে এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলে যান।'

তিনি অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে বললেন,

'বেটা! আল্লাহর শপথ, আমার জানা মতে বিশাল এই পৃথিবীর বুকে এখন এমন কেউ বেঁচে নেই যিনি আমাদেরই মতো সত্য ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে আশার কথা এই যে, খুব শিগগিরই আরবভূমিতে আত্মপ্রকাশ করবেন ইবরাহিমী ধর্মের অনুসারী এক মহান নবী, যিনি নিজ জন্মভূমি থেকে হিজরত করবেন খেজুর বাগান শোভিত অঞ্চলে। যা হবে কালো কালো পাথরে ঘেরা দুই প্রান্তরের মাঝে অবস্থিত। তাঁর নবুওয়াতের বেশ কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকবে।

যেমন: তিনি নিজের জন্য হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করবেন। খাবেন।

কিন্তু সাদাকা-যাকাত নিজের জন্য গ্রহণ করবেন না। খাবেন না।

তাঁর মুবারক দুই কাঁধের মধ্যখানে শোভা পাবে মহরে নবুওয়াত।'

পাদ্রী তার কথা শেষ করলেন এই বলে,

'বেটা! যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমার মৃত্যুর পর সেই অঞ্চলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ো।'

তার মৃত্যু হয়ে গেল। আমি বেশ কিছুদিন আম্মুরিয়াতেই থেকে গেলাম। এরই মধ্যে আরবের 'কালব' গোত্রের এক বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমার জন্য বিরাট সুবর্ণ সুযোগ। আমি তাদের কাছে প্রস্তাব দিলাম,

'তোমরা যদি আমাকে আরব দেশে পৌঁছে দিতে রাজি হও, তাহলে আমার এইসব গাভী ও বকরী তোমাদের দিয়ে দেব।' তারা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তাদের হাতে তুলে দিলাম। আমাকে সঙ্গী বানিয়ে তারা চলতে শুরু করল। 'ওয়াদিল কুরা'য় (মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে) পৌঁছার পর তারা আমার সঙ্গে গাদ্দারী করে বসল। জনৈক ইহুদীর নিকট আমাকে বিক্রি করে দিল। ক্রীতদাস হিসাবে আমি ইহুদীর চাকরি করতে থাকলাম।

একদিন তার কুরাইযা বংশীয় এক চাচাতো ভাই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। তিনি ঐ মালিক এর নিকট থেকে আমাকে কিনে নিলেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ইয়াসরিবে। সেখানে পৌঁছার পর আমি দেখলাম সেই খেজুর বাগানের দৃশ্য-যার কথা আমাকে বলেছিলেন 'আম্মুরিয়া'র পাদ্রি। তার বর্ণনা অনুসারে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে মদীনাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হলো না। তখন থেকে নতুন ইহুদী মালিকের সঙ্গে মদীনাতেই আমার বসবাস শুরু হলো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততদিনে মক্কাতে মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু গোলামীর জীবনের দুর্ভাগ্য আর দিন-রাত মুনিবের কাজে ব্যস্ততার দরুন নবীজীর কোনো খবরই আমি জানতে পারলাম না। তাঁর সম্পর্কে আমি অন্ধকারেই থেকে গেলাম।

***

এরপর তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌছে গেলেন। একদিন আমি মুনিবের খেজুর বাগানে একটি গাছের ওপর চড়ে কাজ করছিলাম। আমার মুনিব সেই গাছের নিচেই বসা ছিলেন, এমনি মুহূর্তে তার কাছে এলেন তার এক চাচাতো ভাই এবং বললেন,

'আল্লাহ তাআলা মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রকে ধ্বংস করুন।

তারা এখন কুবাতে সমবেত হয়েছে একটি লোককে কেন্দ্র করে-যিনি আজই মক্কা থেকে এসেছেন এবং যিনি নিজেকে নবী বলে দাবি করে থাকেন।'

দীর্ঘ প্রতিক্ষিত এই সংবাদ আমার কানে ঢোকামাত্রই আমার শরীরে যেন জ্বর এসে গেল। সারা দেহে প্রচণ্ড কাঁপুনি শুরু হলো, আমি ব্যাকুল ও অস্থির হয়ে পড়লাম। আমার আশঙ্কা হলো হয়তো এখনই মুনিবের মাথার ওপর পড়ে যাব। অতি দ্রুত গাছ থেকে নেমে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম,

'আপনি কী যেন বলছিলেন, আরেকবার বলুন তো!'

আমার মুনিব ভীষণ ক্ষেপে গেলেন এবং খুব জোরে আমাকে একটি ঘুসি মেরে বললেন,

'আরে! এটা নিয়ে তোর মাথা ব্যথা কেন? যা, তোর কাজে যা।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমি নিজের জমানো কিছু খেজুর নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। তাঁর সম্মুখে হাজির হয়ে বললাম,

'আমি জেনেছি আপনি খুবই ভালো মানুষ, আপনার সঙ্গী-সাথীরা দেশ ছেড়ে এসে খাদ্য ও অর্থের অভাবে পড়ে গেছেন। আমার কাছে এই সাদাকার খেজুরগুলো ছিল। আমার মনে হলো আপনারাই এর বেশি হকদার।'

এই বলে আমি তাঁর সম্মুখে খেজুরগুলো রেখে দিলাম। তিনি সাহাবীদের বললেন,

'এই নাও.. তোমরা এগুলো খাও।'

নিজে তিনি একটি খেজুরও খেলেন না, সবই সঙ্গীদের দিয়ে দিলেন।

এটা দেখে আমি মনে মনে বললাম, যাক.. একটি আলামত মিলে গেল। এরপর আমি ফিরে এলাম। আবার খেজুর জমানো শুরু করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন 'কুবা' থেকে মদীনায় এসে গেলেন, আমি তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম,

'প্রথমবার বুঝতে পেরেছি আপনি সাদাকার খাদ্য-খাবার নিজে গ্রহণ করেন না। এজন্য আপনার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ হাদিয়া হিসাবে এই খেজুরগুলো এনেছি...'

এবার তিনি নিজেও খেলেন এবং সঙ্গীদেরও নিজের সঙ্গে খেতে বললেন।

আমি মনে মনে বললাম, দ্বিতীয় আলামতটাও মিলে গেল। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম মদীনার বিখ্যাত কবরস্থান 'বাকীউল গারকাদ'এ। সেখানে তিনি একজন সাহাবীর দাফন কাজে অংশগ্রহণ করছিলেন। আমি দেখলাম তিনি বসে আছেন, তাঁর শরীরে ছিল মোটা দুইটি চাদর। আমি প্রথমে তাঁকে সালাম দিলাম, তারপর তাঁর মুবারক পিঠের দিকে তাকিয়ে পেছনে এসে দাঁড়ালাম যেন আম্মুরিয়ার পাদ্রি বর্ণিত সেই মোহরে নবুওয়াত দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে বারবার তার পিঠ মুবারকের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখলেন, তিনি আমার মতলব বুঝে ফেললেন। তিনি পিঠ মুবারক থেকে চাদর ফেলে দিলেন। এবার তাকাতেই আমি নবুওয়াতের মোহরটি দেখতে পেলাম। সকল নিদর্শন মিলে যাওয়ার ফলে সব-সংশয় দূর হয়ে গেল। আমি নবীকে চিনে ফেললাম এবং নিচু হয়ে সেখানে চুমু দিয়ে আনন্দে কাঁদতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার অবস্থা দেখে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ব্যাপার কী বলোতো?'

আমার পুরো কাহিনী তাঁকে শোনালাম। সত্যের জন্য আমার দীর্ঘ সংগ্রামের কাহিনী শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। তাঁর আগ্রহের কারণে তাঁর সাহাবীদেরও নিজ মুখে আবারও আমার কাহিনী শোনাতে হলো। তারাও শুনে ভীষণ বিস্মিত এবং মহাখুশি হলেন।

***

সালাম ও অভিবাদন সালমান আল-ফারসীর প্রতি যেদিন তিনি সত্য সন্ধানের অবিরাম সাধনা ও সংগ্রামের দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন।

সালাম ও অভিবাদন সালমান আল-ফারসীর প্রতি যেদিন তিনি সত্যকে চিনে তার প্রতি সুদৃঢ় ঈমান এনেছিলেন।

সালাম ও অভিবাদন তাঁর প্রতি যেদিন তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে এবং পরকালে যেদিন তাঁর পুনরুজ্জীবন হবে।

আবু আইয়ুব আল-আনসারী

যাকে দাফন করা হয়েছে কনস্টান্টিনোপল এর নগর-প্রাচীরের পাদদেশে।

প্রিয় নবীর বিখ্যাত এই সাহাবীর প্রকৃত নাম খালিদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুলাইব। মদীনার বিখ্যাত 'নাজ্জার' তাঁর বংশের নাম। মক্কা থেকে হিজরত করে আসা প্রিয় নবী ও অন্যান্য সাহাবীকে সকল প্রকার সাহায্যদানকারী আনসারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে এই সাহাবীর পরিচিত ডাক নাম 'আবু আইয়ূব আল-আনসারী'।

মুসলিমজাতির মাঝে এমন কে আছে যে আবু আইয়ূব আল-আনসারীর নাম জানে না?

আল্লাহ তাআলা তাঁর সুনাম ও খ্যাতি সমুন্নত করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমে। তাঁর মর্যাদা উঁচু করেছেন সমগ্র বিশ্বে। কারণ, আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো মুসলিমের নয়, তাঁরই গৃহকে নির্বাচন করেছিলেন প্রিয় নবীর বসবাসের জন্য, যখন তিনি হিজরত করে মক্কা থেকে এসে পৌঁছেছিলেন মদীনায়। এই সাহাবী আবু আইয়ুবের গৌরবের জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট।

আবু আইয়ুবের গৃহ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বসবাসের জন্য কিভাবে নির্বাচিত হলো-এ ব্যাপারে রয়েছে এক চমৎকার কাহিনী, যার আলোচনা ভারি মিষ্টি ও মজাদার।

ঘটনাটি ছিল এরকম: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছলেন, তখন মদীনার লোকেরা তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

প্রেমাস্পদের আবেগঘন হৃদয়াবেগ আর প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি তারা বিছিয়ে দিলেন তাঁর আগমন পথে...

তারা খুলে দিলেন নিজেদের হৃদয়ের দুয়ারগুলো যেন তিনি প্রবেশ করেন তাদের হৃদয়ের গভীরে...

তারা উন্মুক্ত করে দিলেন নিজেদের গৃহের দুয়ারগুলো যেন তিনি গ্রহণ করেন সর্বাধিক আরামদায়ক গৃহটি।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার উপকণ্ঠে 'কুবা'য় কাটালেন চারদিন, এই সময়ে তিনি সেই প্রথম মসজিদ স্থাপন করলেন যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে তাকওয়ার বুনিয়াদের ওপর।

কুবা থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যখন তিনি বের হলেন, তখন সেই পথে 'ইয়াসরিব' (মদীনা)-এর নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়ে গেলেন সারিবদ্ধ হয়ে। প্রত্যেকের কামনা,

আমার গৃহটিই হোক নবী অবতরণের গৌরবে গর্বিত...

একের পর এক প্রত্যেক সরদার উটনীর সম্মুখে এসে নিবেদন করল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! দয়া করে আমাদের কাছে থাকুন, আমাদের জনবল, অস্ত্রবল আর সকল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসহ আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকব।'

তিনি তাদের জবাব দেন,

'তোমরা উটনীর পথ ছেড়ে দাও, ওর চলাফেরা ও গতিবিধি আল্লাহর হুকুমে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।'

উটনীটি চলতে থাকল আপন গতিতে, অনেক জোড়া চোখ অনুসরণ করতে থাকল তাকে। হৃদয়গুলো ভেবে অস্থির- আজ কার ভাগ্য খুলবে কে জানে!

যে বাড়িটি পার হয়ে যাচ্ছিল, তার বসবাসকারীদের অন্তর ভেঙ্গে যাচ্ছিল, তারা হয়ে পড়ছিলেন হতাশ, সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী বাড়িওয়ালাদের বুকে জ্বলে উঠছিল আশার আলো।

এভাবেই উটনীটি এগিয়ে যাচ্ছিল আর লোকেরাও তার পিছে পিছে আফসোস ও পরিতাপ বুকে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন 'আজকের সৌভাগ্যবান লোকটি কে' দেখার জন্য। অবশেষে উটনীটি আবু আইয়ূব আল-আনসারীর বাড়ির সম্মুখে খোলা ময়দানে গিয়ে পৌঁছল, সেখানেই বসে পড়ল।

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামলেন না।

সামান্য একটু পরেই উটনীটি উঠে পড়ল এবং আবারও চলতে শুরু করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঢিল দিয়ে রাখলেন তার লাগামে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে আবার একই পথে ফিরতে লাগল এবং প্রথম স্থানটিতেই এসে বসে পড়ল।

তখন আবু আইয়ূব আল-আনসারীর হৃদয়ে আনন্দ ও খুশি উপচে পড়ল। তিনি ছুটে গিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানালেন। 'মারহাবা' 'মারহাবা' বলে তাঁর সামান বহন করতে লাগলেন যেন তিনি সারা দুনিয়ার সকল সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন-যা তিনি বহন করে নিচ্ছেন নিজ বাড়িতে।

***

আবু আইয়ূবের বাড়িটি ছিল দোতলা, তিনি উপরের তলাটি খালি করে ফেললেন রাসূলকে সেখানে রাখার জন্য...

কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর তলার চেয়ে নিচের তলাকেই নিজের জন্য প্রাধান্য দিলেন। আবু আইয়ূব মেনে নিলেন তাঁর হুকুম এবং তাঁর থাকার জন্য সে স্থানটিই নির্ধারণ করলেন যা তাঁর পছন্দ। রাত যখন ঘনিয়ে এল, প্রিয় নবী চলে গেলেন বিছানায়। আবু আইয়ূব এবং তার স্ত্রী উপরের তলায় চড়ে বসলেন। দরজা বন্ধ করতে না করতেই নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তিনি স্ত্রীকে ডেকে বললেন,

'ছি: ছি: ছি: এটা কী সর্বনাশা কাণ্ড করলাম আমরা বলো তো?

আল্লাহর রাসূল নিচে আর আমরা থাকব তাঁর ওপরে?!

আমরা আল্লাহর রাসূলের ওপর দিয়ে হাঁটব, চলব?!

আমরা হব নবী ও ওহীর মাঝে অন্তরায়?! এমন হলে আমাদের সর্বনাশ হতে বাকি থাকল কী?'

স্বামী-স্ত্রী পড়ে গেলেন মহাদুশ্চিন্তায়, যার কোনো সমাধান তাদের জানা নেই। তারা এখন কী করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না।

তারা সামান্য স্বস্তি পেলেন যখন এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে আমরা একেবারে সেই পার্শ্বে চলে যাই যা সোজাসুজি রাসূলের ওপরে নয়। তারা আরও সিদ্ধান্ত নিলেন, মধ্যখান থেকে দূরে শুধুমাত্র পাশ দিয়েই তারা চলাফেরা করবেন।

আবু আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু আনহু সকাল বেলা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন,

'আল্লাহর কসম! আজ রাতে আমাদের একটুও ঘুম হয়নি বরং দু'চোখের পাতাও আমি এবং উম্মে আইয়ূব (আইয়ূবের মা) এক করতে পারিনি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কী কারণে এমন হলো হে আবু আইয়ূব?'

'আমার মনে হলো আমি এমন এক ঘরের ওপর তলায় রয়েছি, যার নিচে রয়েছেন আপনি। আমি যদি সেখানে হাঁটা-চলা করি তাহলে আপনার ওপর ধুলাবালি পড়ে আপনার কষ্টের কারণ হয়ে যাবে। তা ছাড়া এটাও মনে হয়েছে, আমি হয়ে গেছি ওহী এবং আপনার মাঝখানে অন্তরায়।'

রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

'হে আইয়ূবের পিতা! বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করো। আমার নিকট বহু মানুষ আসা-যাওয়া করতে থাকে বলে নিচে থাকাটাই আমার জন্য সহজ।'

***

আবু আইয়ূব বলেন :

'আমি আল্লাহর রাসূলের আদেশ মেনে নিয়ে ওপর তলাতেই বসবাস চালাতে থাকলাম। ভীষণ শীতের এক রাতে হঠাৎ ঘটল এক দুর্ঘটনা। পানির কলস ভেঙ্গে দোতলার মেঝে একেবারে ভেসে গেল। আমি এবং উম্মে আইয়ূব একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম। হায়! এই পানি এই শীতে যদি গড়িয়ে গিয়ে রাসূলের কষ্টের কারণ হয়ে যায়! আমাদের কাছে সেই পানি শোষণের কোনো ব্যবস্থাও নেই। অবশেষে আমরা পাগলের মতো শীত নিবারণের একমাত্র কম্বলটি দিয়ে সব পানি শোষণের কাজ করতে শুরু করলাম। যেন এক ফোটা পানিও রাসূলের মুবারক গায়ে না পড়ে।

যখন সকাল হলো আমি চলে গেলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট। বললাম, 'আপনার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গিত, আমি আপনার উপরে থাকা এবং আপনি আমার নিচে থাকা আমার ভালো লাগছে না। রাতের ঘটনা খুলে বললাম ফলে তিনি আমার আবদার মেনে নিয়ে ওপর তলায় থাকতে রাজি হলেন। আমি এবং উম্মে আইয়ূব নেমে এলাম নিচ তলায়।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন প্রায় সাত মাস। এক সময় সেই খোলা ময়দানে নবীজীর মসজিদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল যেখানে এসে উটনী বসেছিল। এরপর তিনি চলে গেলেন সেই কামরাগুলোতে যা মসজিদের পাশে নির্মাণ করা হয়েছিল তাঁর ও তাঁর স্ত্রীদের জন্য। যার ফলে এবার তিনি হয়ে গেলেন আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রতিবেশী। কী চমৎকার দুই প্রতিবেশী।

***

আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত বেশি ভালোবাসতেন, যে ভালোবাসা তাঁর হৃদয় ও বিবেকের দাবিকেও অতিক্রম করেছিল। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আবু আইয়ূবকে এত ভালোবাসতেন, যা তাদের পরস্পরের মাঝের লৌকিকতাকে দূর করে দিয়েছিল এবং সেই ভালোবাসার কারণেই তিনি আবু আইয়ূবের বাড়িকে নিজের বাড়ির মতোই মনে করতেন।

সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের এক দুপুরে আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু বাড়ি থেকে বের হয়ে চলে এলেন মসজিদে নববীতে। উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আবু বকর! এমন অসময়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্য কী?'

'প্রচণ্ড ক্ষুধার কষ্টে বাড়িতে থাকা দায় হয়ে পড়েছিল।'

একথা শুনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমিও বের হয়েছি একই কারণে।'

তাদের দু'জনের এই কথাবার্তার মাঝে ঘর থেকে বের হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই অসময়ে কে তোমাদের ঘর থেকে বের করে আনল?'

'আল্লাহর কসম! তীব্র ক্ষুধার যন্ত্রণাই আমাদের বের করে এনেছে।'

প্রিয় নবী বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমারও তো একই অবস্থা। প্রচণ্ড ক্ষুধা আমাকেও ঘর থেকে বের করে এনেছে। এক কাজ করো, তোমরা দু'জনেই আমার সঙ্গে এসো।'

তারা উভয়ে রাসূলের সঙ্গী হলেন। এরপর একসঙ্গে সকলে গিয়ে হাজির হলেন আবু আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর দরজায়।

আবু আইয়ূব রাযিয়াল্লাহু আনহুর অভ্যাস ছিল, প্রতিদিনই তিনি রাসূলের জন্য খাবার প্রস্তুত করে রাখতেন। অপেক্ষা করে করে শেষ সময়ে যখন নিশ্চিত হতেন যে আজ তিনি আসবেন না, তখন সেই খাবার পরিবারের সকলে মিলে খেয়ে ফেলতেন।

যখন তারা তিনজন দরজায় পৌঁছলেন, আইয়ূবের মা তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন,

'আল্লাহর নবী ও তাঁর সঙ্গীদের সকলকেই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন,

'আইয়ূবের বাবা (আবু আইয়ূব) কোথায়?'

আবু আইয়ূব সন্নিকটে তারই খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি রাসূলের আওয়াজ শুনে ছুটতে ছুটতে সেখানে হাজির হয়ে বললেন,

مَرْحَبًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ وَبِمَنْ مَعَهُ

'আল্লাহর প্রিয় রাসূল ও তাঁর সঙ্গীদের সকলকেই স্বাগতম।'

এরপর তিনি আরও বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইতিপূর্বে আর কখনো আপনি এমন সময়ে আসেননি। যে কারণে পূর্বক্ষণেই আমি খেদমতে হাজির থাকতে পারিনি।'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওজর কবুল করে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, এমন অসময়ে তোমার বাড়িতে আর কখনো আসা হয়নি।'

আবু আইয়ূব আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু ইতিমধ্যে তাঁদের চেহারায় ক্ষুধার কষ্ট পড়তে পারলেন। ফলে তিনি খেজুরের বাগানে ছুটে গিয়ে একটি কাঁদি কেটে আনলেন যাতে ছিল সম্পূর্ণ পাকা, আধাপাকা এবং একেবারে টসটসে তাজা মিষ্টি খেজুর।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'পুরো খেজুরের কাদিটা কেটে আনার কী প্রয়োজন ছিল? শুধু 'তামার' (পূর্ণ পাকা) গুলো ছিঁড়ে আনলেই তো হতো।'

উত্তরে তিনি বললেন,

'আমার যে খুব ইচ্ছা হলো আপনাকে বাগানের পাকা, তাজাপাকা, তাজা সবরকমের খেজুর খাওয়াতে। তাই কাদি ধরে কেটে এনেছি। এছাড়া আপনাদের জন্য এখনই ছাগল জবাই করব।'

তিনি বললেন, 'দুধাল বকরী জবাই করবে না।'

আবু আইয়ূব একটি খাশি জবাই করে স্ত্রীকে বললেন,

'আটা খামির করো এবং সুন্দর করে রুটি বানাও। তুমি তো রুটি চমৎকার বানিয়ে থাক।'

উম্মে আইয়ূব অর্ধেক ছাগল ছানা দিয়ে ঝোল রান্না করলেন আর বাকি অর্ধেক ভুনা করলেন। রান্না করা শেষ হলে যখন সেগুলো নবীজী এবং সঙ্গীদের সামনে রাখা হলো, প্রিয় নবী এক টুকরা গোশত রুটির ওপর রেখে আবু আইয়ূবকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি এটা ফাতেমাকে পৌঁছে দিয়ে এসো.. অনেকদিন থেকেই সে এমন খাবার খায়নি।'

তাঁরা সকলে খেয়ে দেয়ে পরিতৃপ্ত হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আহা! এত চমৎকার খাবার! রুটি, গোশত, খেজুর, পাকা ও তাজা খেজুর...' বলতে বলতে তাঁর দু'চোখ ভিজে গেল। এরপর তিনি বললেন,

'কসম সেই মহান আল্লাহর যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আমার জীবন। এসব হলো সেই নেয়ামত যার সম্পর্কে কেয়ামতের ময়দানে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। এধরনের সুস্বাদু খাবার অথবা যেকোনো খাবার যখনই গ্রহণ করবে, শুরুতে বলবে বিসমিল্লাহ। শেষ হলে বলবে, আলহামদুলিল্লাহ (প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদের খাওয়ালেন এবং পরিতৃপ্ত করলেন।)'

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠতে উঠতে আবু আইয়ূবকে বললেন, 'তুমি আগামীকাল এসো..'

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল এরকম, কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো সদাচরণ করলেই তিনি তার প্রতিদান দিতে চাইতেন। সে কারণেই তিনি আবু আইয়ূবকে পরের দিন দেখা করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তিনি রাসূলের কথাটি বুঝতে পারলেন না। ফলে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু কথাটি তাকে বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'প্রিয় নবী তোমাকে আগামীকাল যেতে বললেন হে আবু আইয়ূব।'

তিনি তখন বললেন, 'প্রিয় নবীর আদেশ শিরোধার্য।'

পরের দিন যখন আবু আইয়ূব প্রিয় নবীর কাছে গেলেন, তিনি তাকে একটি ছোট কিশোরী দাসী দান করলেন এবং বললেন,

'হে আবু আইয়ূব! এর সঙ্গে ভালো ব্যবহার কোরো। কারণ সে যতদিন থেকে আমাদের কাছে রয়েছে তার মাঝে আমরা শুধু ভালো স্বভাবই পেয়েছি।'

***

আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু কিশোরী দাসীটিকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরে এলেন, উম্মে আইয়ূব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

'কার মেয়ে এটা?'

'আমাদেরই, আল্লাহর রাসূল একে আমাদের জন্য দান করেছেন।'

'কী মহান দাতা! কী চমৎকার দান!!'

'তিনি আমাদেরকে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।'

'কেমন ব্যবহার তার সঙ্গে করলে রাসূলের নির্দেশ যথার্থ পালিত হবে?'

'আমার মনে হয়, রাসূলের নির্দেশ পালনের সর্বোত্তম পন্থা হতে পারে তাকে স্বাধীন করে দেওয়াই।'

'তুমি একদম ঠিক কথাটাই বলেছ, আল্লাহ তাওফিক দান করুন।

তারা তাকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিলেন।'

আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু জীবনের দীর্ঘসময় কাটিয়েছেন গাজী হিসাবে। এমনকি মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত ছিল, মুসলিমবাহিনী নবীযুগ থেকে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর যুগ পর্যন্ত যত জিহাদ করেছে, তার কোনোটা থেকেই তিনি দূরে থাকেননি।

তার সর্বশেষ জিহাদ ছিল মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর পুত্র ইয়াযীদের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের অভিযান। আবু আইয়ূব ছিলেন সে সময় প্রায় আশি বছর বয়সী এক বৃদ্ধ। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়স আর দুর্বল দেহ তাঁকে ফেরাতে পারল না ইয়াযীদের পতাকা তলে শামিল হওয়া থেকে এবং সাগরের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা চিরে আল্লাহর পথে জিহাদে এগিয়ে যাওয়া থেকে। কিন্তু শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘাত খুব বেশিদূর এগুতে পারল না, এরই মধ্যে আবু আইয়ুব আনসারী রাযিয়াল্লাহ আনহু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন যা তাকে লড়াই চালিয়ে যাওয়া থেকে অপারগ করে দিল।

সেনাপতি ইয়াযীদ তার শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে এসে জিজ্ঞাসা করলেন,

'হে আবু আইয়ূব! আপনার কী খেদমত করতে পারি বলুন।'

তিনি বললেন,

'মুসলিমসৈনিকদের আমার সালাম জানিয়ে বলুন, আবু আইয়ূব তোমাদের অসিয়ত করছে তোমরা কোনো অবস্থাতেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ থেকে নিবৃত্ত হবে না। আল্লাহর ওপর ভরসা করে শত্রুভূমির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জয় করে তবেই থামবে। আমার লাশ নিয়ে হলেও তোমরা ইস্তাম্বুলের শেষ সীমা পর্যন্ত এগিয়ে যেয়ো এবং সেখানেই আমার কবর দিয়ো।'

একথা বলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

মুসলিমসৈনিকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সাহাবীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণে লাফিয়ে পড়লেন ময়দানে। শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ করে আক্রমণ চালালেন এবং শেষ পর্যন্ত আবু আইয়ূব আল-আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাশ কাঁধে নিয়ে তারা ইস্তাম্বুলের নগর-প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে গেলেন এবং সেই নগর-প্রাচীরের পাদদেশেই তাঁকে দাফন করলেন।

***

আল্লাহ তাআলা রহম করুন আবু আইয়ূব আল-আনসারীর প্রতি। কারণ, আল্লাহর পথে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে লড়াই করতে করতে লাভ হয় যে মরণ, নিজের জন্য তিনি তাই কামনা করেছেন। আশি বছরের বার্ধক্যও তাঁকে এই সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ
(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু)

হে আল্লাহ, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে ক্ষমা করে দাও।

দীনের পথে তার সকল প্রতিবন্ধকতার অপরাধ মাফ করে দাও।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের জীবন বীরত্ব ও সাহসের এক মহাকাব্য...

ক্ষুদ্র বংশপ্রীতি আর সাহসিকতা দ্বারা যার সূচনা...

বিশ্বজয়ী বিপ্লবী বিশ্বাস আর মানবতা দিয়ে যার শুভ সমাপ্তি...

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন মাখযূম গোত্রের সন্তান,

আর এই মাখযূম ছিল কুরাইশ বংশের শীর্ষস্থানীয় শাখা।

তার লালন-পালন ও বিকাশ-বর্ধন ঘটেছিল কুরাইশের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত, সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত এবং ঐশ্বর্যে সর্বাধিক প্রাচুর্যবান পরিবারে।

তার চাচা হিশাম ছিলেন জাহেলী যুগের বিখ্যাত ফিজার যুদ্ধের প্রধান কুরাইশী সেনাপতি।

তার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আরবের লোকেরা সময় গণনা করত যেমনিভাবে অন্যসব বড় বড় ঘটনাকে কেন্দ্র করে তারা এটা করত। তার শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে কুরাইশের লোকেরা তিনদিন পর্যন্ত মক্কার বাণিজ্যকেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছিল।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আরেক চাচা ফাকিহ ইবনে মুগীরা ছিলেন সময়ের অন্যতম সেরা সম্মানী ব্যক্তি। তার ছিল একটি বিখ্যাত মেহমানখানা। যেখানে বিনা অনুমতিতেই যেকোনো ব্যক্তি মেহমান হতে পারত।

তার পিতা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা ছিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনবান ব্যক্তি।

তিনি ছিলেন নানা রকম সম্পদের মালিক। সোনা, রুপা, খেজুর ও নানা ফলের বাগান ছাড়াও তার ছিল বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা। বাগান পরিচর্যা, ব্যবসা পরিচালনা এবং পরিবারের সকলের সেবা ইত্যাদি সকল কাজের জন্য ছিল তার অগণিত দাস-দাসী। তার মতো এত স্থাবর, অস্থাবর ধন-সম্পদের মালিক আর কেউই ছিল না।

এ কারণেই যে বছর কাবার গেলাফ পরাতেন তিনি একা, তো পরের বছর পরাতেন বংশের সকলে মিলে। এ কারণেই তাকে বলা হতো 'অনন্য'।

তাকে উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'রাইহানা কুরাইশ' বা কুরাইশের ফুল।

তার ব্যাপারেই আল-কুরআন মন্তব্য করেছে,

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا، وَمَهْدُتُ

لَهُ تَنْهِيدًا.

'আমি যাকে অনন্য করে সৃষ্টি করেছি, তাকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি। এবং সদাসঙ্গী পুত্রবর্গ দিয়েছি। তাকে প্রচুর সচ্ছলতা দিয়েছি।' -সূরা আল-মুদ্দাসসির: (৭৪) ১১-১৪।

সীমাহীন দানশীলতার কারণে তার পিতা হাজীদের মেহমানদারির উদ্দেশ্যে অন্য কেউ চুলা জ্বালাক—এটা তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন আল্লাহর ঘরের এই সকল মেহমানের তিনি একাই আপ্যায়ন করবেন। অন্য কেউ এই সৌভাগ্য তার থেকে কেড়ে নিতে পারবে না।

তিনি দাবি করতেন কুরআন অবতরণের এবং নবুওয়াত লাভের জন্য সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি তিনি। তার এই দাবির কথাই আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে উল্লেখ করে বলেছেন,

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

'কাফেরেরা বলে, কুরআন কেন দুই জনপদের কোনো প্রধান ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হলো না?' -সূরা আয-যুখরূখ (৪৩) ৩১

সম্মান, সম্পদ ও ঐশ্বর্যে ঘেরা এমনই এক নেতৃস্থানীয় পরিবারে হিজরতের চৌত্রিশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন অনেক লম্বা...

বিশাল ও দীর্ঘদেহী...

গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ভারিক্কি চেহারার মানুষ...

গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল শ্যামলা।

উমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সঙ্গে ছিল তার চেহারার অনেক বেশি মিল। সে কারণে দুর্বল দৃষ্টির লোকেরা ওই দু'জনের মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলত।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঈমানের দাওয়াত প্রদান শুরু করেন, সে সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ছিলেন প্রায় কুড়ি বছরের এক টগবগে তরুণ যুবক।

তিনি ওই দাওয়াতকে ঘৃণা করে তা থেকে দূরে সরে থাকলেন, কারণ তিনি দেখতে পেলেন এর মধ্যে রয়েছে এখানে একটু বাদ গেছে আপু..

এক নতুন নেতৃত্ব যা তার পারিবারিক নেতৃত্ব নতুন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবে।

যা তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে উৎখাত করবে। এতে দেখলেন এমন এক আধুনিক শীর্ষকর্তৃত্ব, যা তার পিতার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে উৎখাত করবে।

সে কারণে তিনি নিজে এবং তার ভাই উমারা ইবনুল ওয়ালীদ লেগে পড়লেন এর ঘোর বিরোধিতায়।

***

উমারা ইবনুল ওয়ালীদ মুশরিক বাহিনীর সঙ্গে বদরে যুদ্ধে অংশ নিয়ে মুসলিম মুজাহিদদের হাতে বন্দী হলেন।

তাকে মুক্ত করা নিয়ে অনেক কথা হলো। কারণ, তিনি এবং তার পিতা অনেক বেশি ধন-সম্পদের মালিক এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার পরিবার খুব বেশি তৎপর। অতএব অন্যদের মতো সাধারণ কোনো মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

তাকে বন্দীকারী মুক্তপণ দাবি করল চার হাজার দিরহাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ জারি করে দিলেন,

'তার পিতার বড় লৌহবর্ম ও দামি তরবারি এবং হাতল ছাড়া অন্য কিছুই মুক্তপণ হিসাবে গৃহীত হবে না।'

মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী অবস্থায় আপন বিশ্বাসে অটল থাকাকালীন এভাবে দরকষাকষি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে।

অবশেষে তিনি মুক্ত হয়ে পরিবারের কাছে যখন ফিরে গেলেন, গিয়েই তিনি সকলের সামনে কালেমা পড়ে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করলেন।

সকলেই হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল,'তুমি যদি ইসলামই গ্রহণ করবে, তাহলে এত যে দেনদরবার করে আমরা তোমাকে মুক্ত করে আনলাম, এর আগেই তুমি কেন ইসলাম গ্রহণ করলে না?'

জবাবে তিনি বললেন,

'ওই সময় ইসলাম গ্রহণ করলে সবাই বলত, বন্দীদশায় ভয় পেয়ে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, এ জন্যই মুক্তির অপেক্ষা করে এতদিন পর বুঝেশুনে ইসলাম কবুল করেছি।'

এভাবেই তিনি ইসলাম কবুল নিলেও তার ভাই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রয়ে গেলেন কুফরীর সেই তিমিরে।

***

তাই ওহুদ যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী খালিদের হাতে তুলে দিলো ডানপার্শ্বস্থ সৈনিকদের নেতৃত্বের ভার।

ওই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তীব্র আক্রমণের সামনে টিকতে না পেরে মুশরিক বাহিনী ময়দান ছেড়ে পালায়। তাদের সঙ্গে পালাতে থাকেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদও।

পালাতে গিয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ দেখতে পান মুসলিম বাহিনীর পেছন দিকটি অরক্ষিত। প্রকৃতপক্ষে পেছনের ওই পাহাড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পঞ্চাশজন সৈনিককে

পাহারায় নিয়োজিত করে পূর্বেই সতর্ক করে বলে দিয়েছিলেন, 'কোনো অবস্থাতেই তোমরা এই স্থান ত্যাগ করবে না।'

পাহারাদার সৈনিকরা মনে করলেন, রাসূলের ওই নির্দেশনা ছিল যুদ্ধ চলার সময়ের জন্য। যুদ্ধ তো শেষ। শত্রুরা পালিয়ে গেছে। সুতরাং আমীরের নিষেধ সত্ত্বেও তারা রাসূলের নিষেধের ভুল ব্যাখ্যা করে ওই স্থান ছেড়ে ময়দানে চলে যায়। সেই সুযোগে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ তার বাহিনী নিয়ে অপ্রস্তুত, এলোমেলো মুজাহিদদের ওপর তুমুল আক্রমণ চালিয়ে হেরে যাওয়া যুদ্ধে নতুন করে বিজয়ী হয়ে যান।

আবু সুফিয়ান খুশিতে যেন বাতাসে উড়তে থাকেন। তিনি বলেন,

هذَا يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ

'আজ বদরে আমাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলাম। একবার পরাজয় তো অন্যবার জয়। এটাই তো যুদ্ধ।'

***

খন্দক যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী নিজেরাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে মুসলিম বাহিনীর এক এক অংশের ওপর হঠাৎ আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ওপর দায়িত্ব পড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আক্রমণ পরিচালনার।

খালিদ তার দায়িত্বে প্রায় সফল হয়েই গিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সতর্ক প্রহরীদের এবং তাদের প্রধান উসাইদ ইবনে হুযাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সজাগ তৎপরতার কারণে সে পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।

***

হুদাইবিয়া সন্ধির সময়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় পনেরোশো সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কার উদ্দেশে বের হন। খাপের মধ্যে তরবারি ছাড়া লড়াই করার মতো তির-ধনুক, বর্শা বা ঢাল ইত্যাদি কোনো অস্ত্রই তারা বহন করেননি।

কিন্তু মক্কার মুশরিকরা এতে আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা দুইশো যোদ্ধার সঙ্গে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে নিজেদের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলের সাক্ষাতে পাঠাল। এই প্রতিনিধিদের মাধ্যমেই তারা চায় মুহাম্মাদের খবরাখবর সম্পর্কে জানতে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ কাছে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকালেন। এরপর যোহরের নামাযের সময় হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লার আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সঙ্গে সালাতুল খউফ আদায়

করলেন। এই সময় খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ একবার ভাবলেন রাসূলের ওপর আক্রমণ করবেন...

কিন্তু নামায এক পবিত্র আত্মিক গাম্ভীর্য...

আর মুসলিমদের মানসিক প্রশান্তি ও স্থিরতা তার সামনে অন্তরায় হয়ে গেল।

তা ছাড়া তার অন্তরের ভেতরের একজন জাতযোদ্ধার আত্মসম্মান ওই নীতিবিরুদ্ধ আক্রমণ চালাতে অস্বীকৃতি জানাল।

তার প্রাণে এই বিশ্বাস জেগে ওঠে, বাহ্যদৃষ্টির বাইরে মুহাম্মাদের একটি গোপন আত্মার জগৎ আছে। আছে আত্মিক শক্তি ও শান্তি। যেখানে আমার মতো মানুষদের প্রবেশাধিকার নেই। সেই শক্তি ও শান্তির উৎস আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাদের সেই জগতের সন্ধানী হতে হবে।

এটাই ছিল খালিদকে ইসলামের প্রতি নমনীয় করা প্রথম আবেগ।

এরপর বদর যুদ্ধের পরে ইসলাম গ্রহণকারী আরেক ভাই ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদের চিঠি আসে তার কাছে। যেখানে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ সম্পর্কে রাসূলের একটি কথার উল্লেখ

ছিল। আর সেটাই হয়ে যায় তার অন্ধকার থেকে আলোর পথে, কুফরী থেকে ঈমানের পথে উত্তরণের কারণ।

***

চলুন শোনা যাক খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বর্ণনা থেকেই তার ইসলাম গ্রহণের কাহিনি। তিনি বলেন,

'আল্লাহ তাআলা যখন আমার কল্যাণ চাইলেন, আমার হৃদয়ে চির ইসলামের ভালোবাসা ঢুকিয়ে দিলেন। আমার মধ্যে শুভবুদ্ধি জেগে উঠল। আমি বললাম, 'আমি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে এই যে এত যুদ্ধ করলাম, যখনই আমি কোনো যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি আমি ভেবে দেখি যে, সেই যুদ্ধে আমার কোনো লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল না। অনর্থক যুদ্ধ করে এলাম। কেন আমি এই ফালতু যুদ্ধে নিজেকে জড়াচ্ছি? আমি কী চাই? কিছুই না। তাহলে কেন এই যুদ্ধ?

আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, খুব শিগগির মুহাম্মাদ আরব জাতির ওপর বিজয়ী হবে। কোনো শক্তিই তাঁকে দামিয়ে রাখতে পারবে না।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা অব্যাহত রেখে বলেন,

'আমার মনের মধ্যে যখন এই ভাবান্তর সক্রিয় ছিল সেই মুহূর্তে আমার ভাই আমার কাছে চিঠি লিখল। খুলে দেখলাম তাতে লেখা,

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম...

আম্মাবাদ, আজ পর্যন্ত আমার কাছে এক পরম আশ্চর্যজনক জিজ্ঞাসা, ভাই খালিদ তোমার এত এত জ্ঞানবুদ্ধি সত্ত্বেও কী করে তুমি ইসলামের বিরোধিতা করো?

অথচ ইসলামের সর্বজনীন কল্যাণের কথা আজ আর কারও কাছেই অস্পষ্ট নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তোমার সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন খালিদ কোথায়?

আমি বলেছি, একদিন আল্লাহ তাকে পৌঁছে দেবেন আপনার কাছে।

তিনি বলেছেন, খালিদের মতো মানুষের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। সে যদি নিজের শক্তি, সাহস ও রণদক্ষতাকে মুশরিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষে কাজে লাগাতে পারত, তাহলে তার জন্য হতো সেটা অশেষ কল্যাণকর...

আর আমরাও তাকে অন্য সকলের চেয়ে অগ্রগণ্য করতাম। অতএব হে আমার ভাই, অনেক সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছ, এবার সময় এসেছে প্রতিকার করে নাও।'

'আমার ভাইয়ের চিঠি যখন হাতে পেলাম, মদীনার উদ্দেশে রওনা করতে আমি উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটি বারবার আমার মনে আনন্দের দোলা দিচ্ছিল।

আমার মানসিক এই অবস্থার মধ্যে সেই রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমি এক দুর্ভিক্ষকবলিত, বৃষ্টি ও ফসলহীন সংকীর্ণ অঞ্চলে আটকে আছি... এরপর আমি সেখান থেকে বের হলাম এবং পৌঁছে গেলাম এক সবুজ-শ্যামল ফসলে ভরা প্রশান্ত অঞ্চলে।

আমি বুঝলাম আমার জীবনেরই বাস্তব কাহিনি এই স্বপ্ন।

আমি রাসূলের কাছে যাওয়ার পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। চিন্তা করলাম কাকে সঙ্গে নিয়ে যাব?

সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছে গিয়ে বললাম,

'হে আবু ওয়াহাব, আমাদের করুণ অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছ।

পক্ষান্তরে মুহাম্মাদকে দেখো, আরবের সীমা অতিক্রম করে এখন অনারবের মধ্যেও তার বিজয়কেতন উড়তে শুরু করেছে। এখন যদি আমরা তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাই, তাহলে তাঁর মর্যাদা তো আমাদেরও...'

সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কঠোরভাবে আমার বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলল,

কেউই বাদ না থাকে, তবুও আমি কিছুতেই তাঁর অনুসারী হব না।' 'কুরাইশের প্রত্যেকটা মানুষও যদি তার কাছে চলে যায়, যদি আরআমি ভেবে দেখলাম, এখানে কোনো কাজ হবে না। কারণ, এর পিতা আর ভাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল। সফওয়ান সেই হত্যার বদলা চায়। অতএব আমি তার কাছ থেকে সরে পড়লাম।'

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের ইসলাম গ্রহণের কাহিনি বলে চলেছেন,

'আমি সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে রেখে দেখা করলাম আবু জাহালের পুত্র ইকরিমার সঙ্গে। আমি তাকেও সফওয়ানের মতো আগের সেই কথাগুলোই বললাম। ইকরিমাও আমাকে শুনিয়ে দিলো সফওয়ানের মতো অস্বীকৃতিমূলক সাফ কথা।

আমি তখন বললাম,

'এতক্ষণ যা বলেছি এগুলো ভুলে যাও।'

আমি বাড়ি চলে গেলাম। আমার বাহন প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলাম।

ভাবলাম ততক্ষণে আমার বন্ধু উসমান ইবনে আবু তালহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার ইচ্ছার কথাটি জানাই। কিন্তু তখনই আমার মনে পড়ল, তার নিহত আত্মীয়দের কথা। তখন আবার মনে হলো, থাক, ওর সঙ্গে দেখা করার বা আলোচনার দরকার নেই। এরপর আবার ভাবলাম, ধ্যাৎ! দেখা করলে সমস্যা কোথায়? আমি তো এখনই চলে যাব।

আমি তার কাছে গিয়ে সকল বিষয় আলোচনা করলাম এবং আগের দু'জনকে যা যা বলেছিলাম প্রায় একই কথা তাকেও বললাম।

উসমান ইবনে তালহা আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। আমরা রাতের শেষ প্রহরে অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর আমাদের সাক্ষাৎ হলো আমর ইবনুল আসের সঙ্গে।

তিনি আমাদের দেখে বললেন, 'মারহাবা। স্বাগতম তোমাদের দু'জনকে।'
আমরা বললাম,

'তোমাকেও স্বাগতম।'

তিনি আমাদের কাছে জানতে চাইলেন,

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

আমরা বললাম,

'বরং এটা বলুন, আপনি কী উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন?'

তিনি বললেন,

'আগে তোমাদের উদ্দেশ্যটা শুনি...'

আমরা বললাম,

'আমাদের উদ্দেশ্য ইসলাম গ্রহণ করা, মুহাম্মাদের অনুসরণ করা।'

এবার তিনি বললেন,

'একই উদ্দেশ্যে আমিও বের হয়েছি।'

সেখান থেকে আমরা একসঙ্গে মদীনায় পৌঁছলাম। আমার ভাই এসে দেখা করে বলল, তাড়াতাড়ি এসো, আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমার আসার সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন।

তিনি খুশি হয়ে তোমাদের অপেক্ষা করছেন।

আমি দ্রুতপায়ে তাঁর দিকে এগুতে থাকলাম। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি মিষ্টি করে হাসতে থাকলেন। আমি সামনে এসে থামলাম এবং বিনয়ের সঙ্গে সালাম দিলাম। তিনি প্রসন্ন মুখে সালামের জবাব দিলেন।

আমি তখন বললাম,

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূল।'

তিনি বললেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তোমাকে হেদায়াত দান করেছেন। আমি সব সময়ই মনে করতাম, তোমার যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে এবং আশা করতাম তোমার বিবেক যেন তোমাকে কল্যাণ ছাড়া অন্য কোনো ভুল পথে ঠেলে দিতে না পারে।'

***

সেদিন থেকেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনপ্রাণ উজাড় করে দিয়ে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন।

ফেলে আসা দিনগুলোর ব্যাপারে অনুশোচনায় দগ্ধ ও ভীষণ লজ্জিত হতে থাকলেন। একবার তিনি প্রিয় নবীর কাছে মিনতি জানিয়ে বললেন,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো দেখেছেন আমি হক ও সত্যের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কত কত অন্যায়যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। দয়া করে আল্লাহর দরবারে আমার জন্য প্রার্থনা করুন, যেন আমার অতীতের সেই সব গুনাহ মাফ করে দেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবে বলেন,

إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَه

'নিশ্চয় ইসলাম পূর্ববর্তী সকল পাপ মিটিয়ে দেয়, মুছে দেয়।'

এরপরও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের কাছে নিজের আশা ও দাবির কথাটি পুনর্ব্যক্ত করেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كُلَّ مَا سَلَفَ مِنْهُ مِنْ صَدٍ عَنْ سَبِيْلِكَ

'হে আল্লাহ, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দাও। দীনের পথে তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সকল পাপ মার্জনা করে দাও।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এতে খুশি হয়ে যান এবং তার অন্তর শান্ত ও প্রশান্ত হয়ে যায়।

***

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলেন তখন তিনি নিজের চিরসবুজ চিরনবীন বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা করলেন।

আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন বাহিনীর অগ্রভাগে...

যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রাখলেন ডান দিকের ব্যাটেলিয়ানে...

আর বামপাশের ব্যাটেলিয়ানে থাকলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু...

ইসলাম ধর্মে মাত্র কয়েক মাসের নবদীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ঘটনার মাধ্যমে মক্কায় ফিরলেন একজন সেনানায়ক হিসাবে।

***

মক্কা বিজয়ের দিন নতুন মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও খালিদের হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দেওয়া ছিল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অনন্য দূরদর্শিতা। শ্রেষ্ঠনবী হিসাবে নবুওয়াতের দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিজয়ী ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতায় খালিদের থাকবে অনন্য ভূমিকা, দিগবিদিকে কুরআনী পতাকার সমুচ্চ প্রতিষ্ঠায় তার হবে বিশিষ্ট অবদান।

যখন নবীজির ওফাত হয়ে গেল, তিনি চলে গেলেন মহান প্রভুর সান্নিধ্যে এবং খিলাফতের শাসনভার অর্পিত হলো আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর, তখন তার শাসনামলে মুরতাদ ও ভন্ড নবীদের বিরুদ্ধে সকল যুদ্ধে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের ব্যাপক তৎপরতা। তবে তিনি প্রধানতম এবং সর্বাধিক কার্যকর অবদান রেখেছিলেন ওই যুদ্ধগুলোর মধ্যে সর্বাধিক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ মুসাইলামাতুল কায্যাব ও তার বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে ইয়েমেনের মাটিতে ইয়ামামার যুদ্ধে।

***

মুসলিম বাহিনী যখন পারস্য বিজয়ের অভিযানে বের হলেন এই ময়দানে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন, তা ছিল একেবারেই নজিরবিহীন।

পারস্য বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি সর্বমোট পনেরোটি ময়দানে লড়াই করেছেন...

কোনো ময়দানেই তার পরাজয় ঘটেনি। যুদ্ধ পরিকল্পনায় কোনো ত্রুটি ধরা পড়েনি। কোথায়ও তিনি হতাশ ও ব্যর্থ হননি।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ইয়ারমুকের যুদ্ধে পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দানের ঈর্ষণীয় মর্যাদাও ছিল ক্ষণজন্মা এই বিখ্যাত বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দখলে।

***

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একের পর এক বিজয় অর্জন করতে থাকলেন। এতে মুসলিম সৈনিকদের মধ্যে অনেকের মনোভাব জন্ম নিল যে, 'খালিদ থাকলেই বিজয় নিশ্চিত'। খলীফা উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুমিনদের এই ত্রুটি শোধরানো জরুরি মনে করলেন। তিনি চাইলেন এ কথা প্রতিষ্ঠিত করতে যে, 'মুসলিম বাহিনীর বিজয় খালিদের বীরত্বের কারণে নয়, আল্লাহর সাহায্যের কারণে হয়'। খালিদকে তিনি লিখিত নির্দেশ পাঠালেন সেনাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দিতে। এখানেই খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রমাণ করলেন তার শীর্ষ ঈমানী মর্যাদার। অসংখ্য বিজয়ের মহানায়ক, চলমান সেনাদলের প্রধান সেনাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে খলীফার নির্দেশের প্রতি তাৎক্ষণিক আনুগত্য প্রকাশ করলেন। নির্দ্বিধায় নিজের অধীনস্থ সেনাকে সেনাপতি মেনে তারই নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিক হয়ে লড়াই অব্যাহত রাখলেন।

মহান আল্লাহ সুলাইমানের পিতা খালিদের প্রতি রহম করুন...

তিনি ছিলেন মানুষের মাঝে এক ভিন্নধর্মী, অনন্য সাধারণ আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

আবু যর আল-গিফারী

(জুনদুব ইবনে জুনাদাহ)

আসমানের নিচে জমিনের বুকে আবু যরের চেয়ে বেশি সত্যনিষ্ঠ আর কেউ নেই।
-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

'ওয়াদ্দান' উপত্যকা-যা বহির্জগতের সঙ্গে মক্কা নগরীর সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ-সেখানেই দল বেঁধে বাস করতেন গিফার গোত্রের লোকজন।

গিফার গোত্রের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল সেই সামান্য দান-দক্ষিণা যা সিরিয়ায় যাওয়া-আসার পথে কুরাইশের ব্যবসা পরিচালনাকারী কাফেলাগুলো তাদের দিত।

আবার কখনো কখনো তারা কাফেলাগুলোর মাঝে ডাকাতি ও ছিনতাই করেও জরুরি জীবনোপকরণ সংগ্রহ করত-যখন কোনো কাফেলা ওদের চাহিদা পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানাত।

'জুনদুব ইবনে জুনাদাহ' যার ডাক নাম আবু যর-তিনি ছিলেন এই গোত্রেরই একজন সদস্য কিন্তু তাদের সকলের মাঝে জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহসিকতা ও বিচক্ষণতায় তিনি ছিলেন একেবারেই ভিন্ন। ছিলেন একদমই অনন্য।

এই কারণে নিজেদের হাতে গড়া দেব-দেবীর প্রতি তিনি ছিলেন ভীষণ বিরক্ত-কওমের লোকজন আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের পূজা অর্চনা করত।

তিনি চরম ঘৃণা করতেন আবরজাতির অযৌক্তিক বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধর্মীয় মানসিকতাকে। তিনি বুকভরা কৌতূহল আর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন একজন নতুন নবীর আগমন পথের দিকে যিনি মানবজাতির জ্ঞান ও হৃদয় রাজ্যের শূন্যতাকে ভরাট করে দেবেন আর তাদের শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে পৌঁছে দেবেন বিশ্বাসের আলোর পথে।

***

আবু যর তার গ্রামেই ছিলেন। সেখানেই তার কানে এল নতুন নবীর খবর যিনি মক্কায় আবির্ভূত হয়েছেন। এ সংবাদ শোনামাত্রই তিনি নিজ ভাই আনিসকে বললেন,

'ভাই আমার! তুমি মক্কায় যাও। সেখানে গিয়ে সেই মানুষটির তথ্য সংগ্রহ করবে-যিনি নিজেকে নবী দাবি করেন এবং বলেন যে, তাঁর কাছে আসমান থেকে ওহী আসে। তাঁর কিছু আসমানী বাণী মুখস্ত করে আমাকে এসে শোনাবে।'

আনিস মক্কায় চলে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁর মুখে চমৎকার উপদেশমূলক জীবনমুখী নানা কথা শুনলেন। এরপর ফিরে এলেন নিজ গ্রামে। তখন আবু যর খুব কৌতূহল নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ব্যাকুল হয়ে নতুন নবীর খবরা-খবর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি জবাবে বললেন,

'আল্লাহর কসম! তাঁর মাঝে আমি এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব দেখতে পেয়েছি, যিনি উন্নত স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা দেন। তিনি অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেন, কিন্তু তা কবির কাব্যগাথা নয়।'

আবু যর আবার জানতে চাইলেন,

'তাঁর ব্যাপারে অন্য লোকেরা কী বলে?'

জবাব দিলেন,

'লোকেরা তাঁর সম্পর্কে বলে-তিনি যাদুকর, জ্যোতিষী ও কবি।'

আবু যর বললেন,

'নাহ, তুমি মোটেও আমার কৌতূহল মেটাতে পারলে না। এতদূর পথ গেলে-এলে কিন্তু যে প্রয়োজনে তোমাকে পাঠালাম তা পূরণ করতে পারলে না। তুমি কি কয়েকদিনের জন্য আমার পরিবার-পরিজনের দায়-দায়িত্ব নেবে? যেন আমি নিজে গিয়ে তাঁর ব্যাপারে কৌতূহল মেটাতে পারি?'

তিনি বললেন,

'ঠিক আছে, তুমি যাও। তবে মক্কার লোকদের ব্যাপারে তুমি সাবধানে থেক।'

***

আবু যর নিজের জন্য সফরের পাথেয় সংগ্রহ করলেন। নিজের সঙ্গে একটি ছোট্ট পাত্র ভরে পানি নিয়ে পরদিনই মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা করলেন। উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজ-খবর নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

***

আবু যর ভীষণ ভয়ে ভয়ে মক্কায় পৌঁছলেন। দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে সমালোচনার কারণে মুহাম্মাদের প্রতি কুরাইশদের ক্ষোভের খবর এবং তাঁর যে কোনো অনুসারীর বিরুদ্ধে তাদের চরম নির্যাতনের সংবাদ তিনি পেয়েছিলেন। এসব কারণে মক্কায় তিনি মুহাম্মাদের ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ, তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে যাকে জিজ্ঞাসা করব সে কি মুহাম্মাদের পক্ষের লোক নাকি শত্রুপক্ষের?

***

দিন পেরিয়ে যখন রাত নেমে এল তখন তিনি মসজিদের মধ্যে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। সে সময় আলী রাযিয়াল্লাহ আনহু তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বুঝতে পারলেন, নিশ্চয় তিনি ভিনদেশী কোনো পথিক মুসাফির। সুতরাং তাকে বললেন, 'ভাই! চলুন না আমাদের মেহমান হিসাবে আমার বাড়িতে রাত কাটাবেন।' প্রস্তাবে রাজি হয়ে আবু যর চলে এলেন তাঁর সঙ্গে এবং সে রাতটি তাঁর বাড়িতেই কাটিয়ে দিলেন। সকাল হয়ে গেলে তিনি নিজের খাদ্য, পানি ও অন্যান্য সামান নিয়ে আবার মসজিদে ফিরে এলেন। অবাক কাণ্ড! তারা কেউই কাউকে কোনো প্রশ্ন করলেন না।

আবু যরের দ্বিতীয় দিনটিও এভাবেই কেটে গেল-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছুই না জেনে। দিন শেষে রাত ঘনিয়ে এলে মসজিদেই ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে চিন্তা করলেন,

আচ্ছা! ভিনদেশী এই মানুষটি কি আজও তার গন্তব্য খুঁজে পেল না?

এরপর তিনি লোকটিকে আজও সঙ্গে নিয়ে গেলেন। লোকটি দ্বিতীয় রাতও তার বাড়িতে কাটাল কিন্তু মেহমান ও মেজবান কেউ কাউকে কিছুই জিজ্ঞাসা করল না।

তৃতীয় দিনও রাতে একই ঘটনার পর আলী রাযিয়াল্লাহু আনহ মেহমানকে বললেন,

'আপনি কী উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কায় এসেছেন, সেটা কি আমাকে বলবেন না?'

আবু যর জবাব দিলেন,

'আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণে সহযোগিতা করবে এই ওয়াদা যদি করতে পারো তাহলে তোমাকে বলব।'

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার উদ্দেশ্য পূরণে সহযোগিতা করার ওয়াদা করলেন। তখন আবু যর বললেন,

'আমি বহু পথ পাড়ি দিয়ে মক্কায় এসেছি নতুন নবীর সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর বাণী শোনার আকাঙ্ক্ষায়।'

একথা শুনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর চোখে-মুখে আনন্দ ও খুশির ঝিলিক খেলে গেল। তিনি বললেন,

'আল্লাহর কসম! তিনি একজন সত্য নবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সকাল হলে আমরা একসঙ্গে বের হব। আমি যেখানেই যাব তুমি আমার পিছে পিছে আসবে। তোমার জন্য আশঙ্কাজনক কোনো কিছু আমার চোখে পড়লে আমি একটু থেমে যাব থুথু ফেলানো ও নাক ঝাড়ার মতো করে। আবার হাঁটা শুরু করলে তুমি আমার অনুসরণ করবে। আমি যেখানে ঢুকব তুমিও সেখানে ঢুকে পড়বে।'

অপেক্ষার সেই দীর্ঘ রাত আবু যরকে বিছানায় স্থির হতে দিল না। নবীজীকে দেখা এবং ওহীর বাণী শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে তিনি সারারাত ছটফট করতে থাকলেন।

প্রভাতে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মেহমানকে নিয়ে নবীগৃহের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। আবু যর এক মনে শুধু তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর পিছে পিছে হাঁটতে লাগলেন। এক সময় তাঁরা নবীজীর সম্মুখে হাজির হলেন।

আবু যর আবেগভরা কণ্ঠে বললেন,

'আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'ওয়া আলাইকা সালামুল্লাহি ওয়া রহমাতুহু ওয়া বারাকাতুহু।'

আবু যর ছিলেন রাসূলকে সর্বপ্রথম ইসলামী পদ্ধতির সালাম দানকারী। পরবর্তীতে সেই পদ্ধতিই ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু যরের দিকে মনোযোগ দিলেন। তাকে ইসলামের পথে আহ্বান জানালেন, কুরআন শোনালেন। স্থানত্যাগ করার পূর্বেই আবু যর অবিলম্বে ইসলামের কালিমা পড়ে নতুন ধর্মে প্রবেশ করলেন। তিনিই হলেন ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ অথবা পঞ্চম ব্যক্তি।

এবার নিজের জীবনের পরবর্তী কাহিনী শোনানোর দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি খোদ আবু যরের ওপর। তিনি শুরু করলেন এভাবে,

'এরপর আমি মক্কাতে রাসূলের নিকট অবস্থান করতে থাকলাম আর তিনিও এই অবসরে আমাকে ইসলামের শিক্ষা দিতে থাকলেন। আমাকে তিনি কিছুটা কুরআন পড়াও শেখালেন। তারপর বললেন,

لَا تُخْبِرْ بِإِسْلَامِكَ أَحَدًا فِي مَكَّةَ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ يَقْتُلُوْكَ.

'মক্কায় কারোর কাছেই তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করো না। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, এটা জানতে পারলে ওরা তোমাকে খুন করে ফেলবে।'

আমি তখন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বললাম, 'শপথ সেই মহাশক্তিধর আল্লাহর! যাঁর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে আমার জীবন। আমি মসজিদুল হারামে গিয়ে যতক্ষণ কুরাইশী দলবলের সম্মুখে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার না করতে পারব ততক্ষণ মক্কা ছেড়ে যাব না।' একথা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে রইলেন, কিছুই বললেন না।

কুরাইশের লোকেরা যখন দল বেঁধে মসজিদুল হারামের মধ্যে বসে গল্পে মেতেছিল, সেই মুহূর্তে আমি গিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড়ালাম এবং আমার শরীরের সর্বশক্তি ব্যয় করে চিৎকার করে ডাক দিলাম, 'ওহে কুরাইশের লোকেরা! আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।'

আমার কথা তাদের কানে যেতে না যেতেই তারা ভয়ে আঁতকে উঠল। তারা বসা থেকে এমনভাবে নড়ে উঠল যেন কোনো দুঃস্বপ্ন দেখে আতঙ্কে ঘুম ভেঙ্গেছে। তারা হৈ চৈ করে বলে উঠল, ধর...ধর... এই বেটা ধর্মত্যাগীকে ধর।' একসঙ্গে সকলে ছুটে এসে আমাকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলল। মনে হলো যে, আমার বেঁচে থাকাই কঠিন। সেই মরণাপন্ন অবস্থায় আমাকে দেখতে পেলেন নবীজীর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তাদের হাত থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য তিনি ঝুঁকে আমাকে ভালোভাবে দেখার পর তাদের শাসিয়ে বললেন,

'তোমরা নিজেদের এমন সর্বনাশ করতে যাচ্ছ! গিফার গোত্রের একজন লোককে এভাবে মেরে ফেলতে চাচ্ছ অথচ তোমাদের সকল বাণিজ্য কাফেলার যাওয়া-আসা করতে হয় তাদের চোখের সামনে দিয়ে?!...' এই ধমকে তারা আমাকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে কেটে পড়ল।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আমি রাসূলের কাছে ফিরে এলাম। আমার দুরবস্থা দেখে তিনি বললেন,

'আমি তো আগেই বলেছিলাম, ইসলাম গ্রহণের কথা কারোর কাছে প্রকাশ কোরো না।'

আমি বিনীত ভাবে বললাম,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! গোপনে ইসলাম গ্রহণের পর জন সম্মুখে তা প্রচার করার এক প্রবল ভাবাবেগ জেগে উঠল আমার অন্তরে। যাকে আমি দমাতে পারলাম না কোনোভাবেই।'

তিনি বললেন, 'যাই হোক, এবার তুমি নিজের কওমের মাঝে ফিরে যাও। এখানে আমার পাশে থেকে যা দেখলে-শুনলে এবং বুঝলে সেগুলো তাদের মাঝে প্রচার করো। তাদের আল্লাহর পথে আহ্বান করো, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা তাদের কল্যাণ করবেন

এবং তাদের সকল নেক কাজের সাওয়াব তোমাকেও দেবেন। পরবর্তীতে যখন শুনতে পাবে আমি বিজয়ী হয়েছি, তখন তুমি আমার নিকট চলে এসো।'

আবু যর বলেন:

'আমি সেখান থেকে রওনা করে আমার কওমের মাঝে ফিরে এলাম।

প্রথমে আমার ভাই আনিস জিজ্ঞাসা করল,

'ভাই! তুমি কী করেছ?'

আমি তাকে বললাম,

'বেশি কিছু না, শুধু ইসলাম কবুল করেছি। নবীকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছি।'

আর একটুও বিলম্ব হলো না আল্লাহ তার হৃদয়ের দুয়ার হিদায়াতের জন্য খুলে দিলেন। সে বলে উঠল,

'তোমার দীনের ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই, সুতরাং আমিও ইসলাম কবুল করলাম এবং নবীজীকে সত্য বলে মেনে নিলাম।'

এবার আমরা দু'জনে মিলে মায়ের কাছে গিয়ে তাকেও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করলাম। আমাদের কথা শুনে তিনি বললেন,

'তোমাদের দু'জনের দীনের ব্যাপারে আমার কোনো অনাগ্রহ নেই।' একথা বলে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন।

সেই দিন থেকে অবিরাম ও অক্লান্তভাবে এই মুমিন পরিবার গিফার গোত্রের লোকজনকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে থাকল। আহ্বানের ফলে তাদের মাঝে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে নামায আদায় করতে লাগলেন।

তাদের ভেতরের কিছু সংখ্যক মানুষ বলল, 'আমরা এখনই ইসলাম গ্রহণ করব না বরং রাসূল যখন মদীনায় আসবেন আমরা তখনই তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করব।'

তারা তাদের কথা রেখেছিল। রাসূল মদীনায় আগমন করলে তারা সকলে মিলে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নবীজী খুশি হয়ে বলেছিলেন,

'গিফার গোত্রকে আল্লাহ মাগফিরাত দান করুন আর আসলাম গোত্রকে সালামতে (নিরাপদে) রাখুন।'

***

আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজ গ্রামেই থেকে গেলেন। এরই মধ্যে বদর, ওহুদ ও খন্দকের মতো ঐতিহাসিক জিহাদের ঘটনাগুলো পার হয়ে গেল। এরপর তিনি মদীনায় এসে নিজের জীবনকে তুলে দিলেন প্রিয় নবীর হাতে। তাঁর কাছে তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। তিনি হয়ে গেলেন তাঁর সোহবত ও খেদমতের বিরল সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা তাকে গুরুত্ব দিতেন, মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতেন। এজন্যই যতবার তার সঙ্গে দেখা হতো ততবারই তিনি হাসি মুখে তার সঙ্গে মুসাফাহা করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যখন ওফাত হয়ে গেল আবু যর রাযিয়াল্লাহ আনহুর পক্ষে মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করা সম্ভব হলো না। নবী ছাড়া এবং নবীজীর মুবারক মজলিস ছাড়া সোনার মদীনার শূন্যতার বেদনা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না। ফলে তিনি সিরিয়ার গ্রামাঞ্চলে চলে গেলেন এবং প্রথম খলীফা ও দ্বিতীয় খলীফার শাসন আমল সেখানেই কাটিয়ে দিলেন।

তৃতীয় খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে একবার তিনি দামেস্ক নগরীতে এলেন। সেখানে মুসলিমদের দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক এবং সুখ-সম্ভোগে তাদের মগ্নতা দেখে তিনি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়লেন এবং জনসাধারণের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। খলীফা উসমান ইবনে আফফান বিশৃঙ্খলার আশঙ্কায় তাঁকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন। তিনি অবিলম্বে খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে মদীনায় হাজির হলেন। কিন্তু এখানে

এসেও অল্প সময়ের মধ্যেই দুনিয়ার সম্পদ সঞ্চয় ও সম্ভোগের প্রতি মানুষের মোহ ও মায়া দেখে তিনি বিতৃষ্ণায় কঠোর ও তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করতে থাকলেন। যার ফলে মানুষ তাঁর ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে পড়ে। খলীফা উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে মদীনার এক জনশূন্য নিঝুম পল্লী রাবযায় গিয়ে বাস করার নির্দেশ দেন। তিনি সেখানেই চলে যান এবং মানুষের সংশ্রব থেকে দূরে একাকী জীবন কাটাতে থাকেন। মানুষের হস্তগত দুনিয়ার মাল-আসবাবের ব্যাপারে নির্মোহ ও নিরাসক্ত হয়ে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রথম দুই খলীফার আদর্শ অর্থাৎ দুনিয়ার ওপর আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার নীতিকে আঁকড়ে ধরে এখানেই কাটিয়ে দিলেন নিজের জীবন।

***

একবার কোনো এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। তাঁর ঘরে ঢুকে লোকটি বারবার এদিক সেদিক তাকাতে লাগল। ঘরের মধ্যে কোনো রকমের কোনো আসবাব দেখতে না পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করে বসল,

'হে আবু যর! আপনার ঘরের আসবাবপত্র কোথায় রেখেছেন?'

তিনি উত্তর দিলেন,

'ওপারে (আখেরাতে) আমাদের একটি বাড়ি আছে, আমাদের ভালো ভালো আসবাব সব সেখানে পাঠিয়ে দেই।'

লোকটি তার কথার মর্ম বুঝে আবার বললেন,

'কিন্তু যতদিন আপনি এই বাড়িতে (দুনিয়ায়) থাকবেন, ততদিন এখানের কিছু আসবাবও তো জরুরি।'

তিনি জবাব দিলেন,

'কিন্তু বাড়ির মালিক তো এখানে থাকতেই দেবেন না। আসবাব দিয়ে কী হবে?'

সিরিয়ার গভর্নর তার জন্য তিনশো দিনার পাঠিয়ে বলে দিলেন,

'এই মুদ্রাগুলো আপনার প্রয়োজনে খরচ করবেন।'

তিনি সেগুলো গ্রহণ করলেন না। ফেরৎ দিয়ে বললেন,

'সিরিয়ার গভর্নর কি আমার চেয়ে তুচ্ছ ও অপদস্থ কোনো আল্লাহর বান্দা খুঁজে পেলেন না...?'

***

হিজরী বত্রিশ সালে এই নিরাসক্ত, নির্মোহ ইবাদতগুজার সাহাবীকে আল্লাহ তাআলা ওফাত দান করলেন—যাঁর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেছিলেন,

مَا أَقَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلَا أَظَلَّتِ الْخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِي ذَرٍّ

'আসমানের নিচে জমিনের ওপর আবু যরের চেয়ে বেশি সত্যনিষ্ঠ মানুষ আর নেই।'

মুসআব ইবনে উমায়ের

(রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম)

ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম ইসলামের সুসংবাদবাহী

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হকের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন তাঁর কাছে ছুটে এলেন সেসব মানুষ যাদের হৃদয়গুলোকে আল্লাহ ঈমানের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন...

আর দূরে সরে রইলেন সেই সব লোক যাদের হৃদয়ে আল্লাহ তাআলা চিরস্থায়ী কুফর ও অবাধ্যতার সিল মেরে দিয়েছেন।

যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা তাঁর চিরন্তন দীনের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর পরিচালিত করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন টগবগে যুবক, মসৃণ ত্বক, সুন্দর ও চমৎকার ললাট, স্বাস্থ্যবান, সচ্ছল জীবনের অধিকারী যুবক...

যার নাম মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

***

একদিন এই সতেজ তরুণ দারুল আরকামে গিয়ে হাজির হলেন, তার পোশাক থেকে সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ছিল, তার চেহারায় ধন-ঐশ্বর্যের ছাপ প্রকাশ পাচ্ছিল...

তার দামি পোশাক জোড়া বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, বিপুল বিত্তের মাঝে তার বসবাস।

***

শান্ত কোমল যুবক গিয়ে হালকা করে দরজার কড়া নাড়ালেন, দরজা খুলে দেওয়া হলো...

তিনি লজ্জা ও আড়ষ্টতার সঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করলেন, কোমল ও শান্ত সুরে উপস্থিত সকলকে সালাম দিয়ে সবার পেছনে বসে পড়লেন।

উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তার ওপর আটকে রইল, তারা তাদের দৃষ্টিকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

কারণ, তারা কত কামনা করেছেন যে এই যুবক এবং এর মতো আরও যারা আছে, আল্লাহ যেন এদের হেদায়েত দান করেন এবং এমন সুন্দর সতেজ তরুণদের যেন কবরের আযাব ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন।

***

রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত সকলকে জান্নাতের সুসংবাদ শোনাচ্ছিলেন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য সতর্ক করছিলেন। যখন জাহান্নামের

ব্যাপারে সতর্ক করছিলেন তখন সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়গুলো জাহান্নাম এবং তার ভয়ংকর আযাবের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিল...

আবার যখন জান্নাতের সুসংবাদের কথা বলছিলেন তখন জান্নাত ও তার নায-নেয়ামতের জন্য তাদের অন্তরগুলো যেন আনন্দে উড়ছিল।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচনার মাঝে মাঝে সাহাবায়ে কেরামকে শোনাচ্ছিলেন কিছু কিছু কুরআনের আয়াত যাতে তাদের অন্তরে শান্তি আর হৃদয়ে প্রশান্তি নেমে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা মহান আল্লাহর কাছে জান্নাতের নেয়ামত আর জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির প্রার্থনা করছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই আলোচনা শেষ করলেন, কুরাইশী যুবক তাঁর কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন, তাঁর নিকটবর্তী হলেন আর পড়ে নিলেন কালেমায়ে শাহাদাত 'আশহাদু আল্লা... ইলা...হা ইল্লাল্লা...হু ও আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ...'

এরপর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং সুখে-দুঃখে সকল অবস্থায় তাঁর আনুগত্যের শপথ নিলেন।

***

তরুণ মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের উসলাম গ্রহণের বিষয়টি সকল মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখলেন। কারণ, তিনি চাইতেন না যে, তার দরদি মা ধর্মত্যাগের সংবাদ শুনে ব্যথিত হোক। কেননা, তিনি জানতেন মায়ের জিদের কথা, জানতেন কুফরীর ওপর তার একগুঁয়েমির কথা।

তিনি এটাও চাইতেন না যে, কুরাইশের লোকেরা তার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জেনে যাক। কারণ, তিনি জানতেন তাদের দেবদেবীকে ত্যাগ করার কথা যারা মনে মনে ভেবেছে তাদের প্রত্যেকের ওপর নির্যাতন ও নিপীড়ন চালানোর দৃঢ়সংকল্প তারা করে রেখেছে। বিশেষত সে মানুষটি যদি হয় তার মতো কুরাইশের উচ্চমর্যাদার কেউ এবং সে সম্পৃক্ত হয় তাদের কোনো বড় বিলাসী ব্যক্তির সঙ্গে।

***

তরুণ যুবক মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসা-যাওয়া করতে থাকলেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকলেন তাঁর নসিহত থেকে।

শেষ পর্যন্ত উসমান ইবনে তালহা তাকে একবার দেখে ফেলল নামাযরত, আর সে-ই এই খবর সবার মাঝে প্রচার করে দিলো।
সেই দিন থেকে শুরু হলো মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরীক্ষা। সেই দিন থেকেই তার পিতামাতা বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম হওয়ার পর থেকে তাকে পরিত্যাগ করে এবং তার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক ইত্যাদি সকল খরচ বন্ধ করে দেয়। এ কারণেই তিনি হয়ে পড়েন তীব্র অভাবগ্রস্ত এবং ভয়ংকর বিপদগ্রস্ত।

কুরাইশের লোকজন তার পিছে লেগে গেল, তারা তাকে বন্দী করে রাখল, তার কারাবাস দীর্ঘ করল। তাকে পরাভূত করে রাখল দীর্ঘদিন। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এসব করে তাকে তারা দীন ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হবে।

কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব! তরুণ যে ঈমানের স্বাদ পেয়ে গেছে।

***

কুরাইশের নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মুসলিমরা যখন হাবশায় হিজরত করলেন তখন এই কুরাইশী তরুণ হিজরতকারীদের দলভুক্ত হয়ে গেলেন।

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীন রক্ষার স্বার্থে হাবশায় হিজরত করে চলে গেলেন, পেছনে ফেলে রেখে গেলেন শৈশবের চারণক্ষেত্র, যৌবনের আবাস আর বংশীয় আত্মগরিমা...

ওইসব কিছুর বদলে পেলেন দারিদ্র্যের কষ্টমাখা এবং প্রবাসের একাকী বন্ধুহীন জীবন।

কিন্তু ওই সকল কষ্টই আল্লাহ এবং রাসূলের সন্তুষ্টির পাশে তার কাছে সহজ ও সহনীয় মনে হতে থাকে।

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন প্রথম হিজরত থেকে ফিরে এলেন মানুষ তাকে চিনতেই পারছিলেন না।

সতেজ প্রাণবন্ত, গোঁফওয়ালা সেই তরুণ আজ আর নেই, দারিদ্র্যের কশাঘাত তাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে।

যার পোশাক থাকত সর্বদা ঝলমলে, আজ তা একেবারেই জীর্ণশীর্ণ...

যার চেহারা ও ত্বক থাকত সর্বদা সতেজ, আজ সেই ত্বক ও চেহারা খসখসে, অমসৃণ...

চেহারায় ভাঁজ পড়ে সংকুচিত হয়ে গেছে, অথচ এক সময় এই চেহারা ও ত্বক হতো নরম তুলতুলে মসৃণ ও উজ্জ্বল, ঝলমলে।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আসতে দেখলেন, তখন তার গায়ে ছিল একটি ভেড়ার চামড়া, আর কোমরে ছিল বেল্ট বাঁধা, তাকে দেখে নবীজি সাহাবীদের বললেন,

أَنْظُرُوا إِلى هَذَا الْفَتَى الَّذِي قَدْ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ ... لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَيْنَ أَبَوَيْنِ يَغْذُوَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ... فَدَعَاهُ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ إِلَى مَا تَرَوْن.َ

'তোমরা এই যুবকের দিকে তাকিয়ে দেখো, যার হৃদয়কে মহান আল্লাহ আলোকিত করে দিয়েছেন। তাকে আমি দেখেছি যখন সে পিতামাতার সঙ্গে ছিল, সে সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ও দামি খাদ্য ও শরাবের ব্যবস্থা তার জন্য করা হতো। আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা আজ তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ।'

***

মুসলিম জাতির জন্য পৃথিবী আরও একবার সংকুচিত হয়ে গেল। তাদের আরও একবার কুরাইশের নজিরবিহীন নির্যাতনের শিকার হতে হলো। বাধ্য হয়ে তারা দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরত করলেন...

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও হিজরতকারীদের সঙ্গে শরীক হলেন।

কিন্তু হিজরত করে হাবশায় চলে যাওয়ার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করতে পারলেন না। যার ফলে তিনি মক্কায় ফিরে কুরাইশদের নির্যাতন সহ্য করতেও প্রস্তুত হয়ে গেলেন, কিন্তু রাসূলকে ছেড়ে দূরে থাকার কষ্ট তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না।

তিনি ছায়ার মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আঁকড়ে ধরে থাকলেন। তাঁর আদর্শ ও চরিত্র-মাধুরীর শিক্ষা নিলেন যথাসাধ্য। ফলে তিনি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে হয়ে উঠলেন অন্যতম সেরা কুরআনের হাফেয...

ইসলামী শরীয়তের অন্যতম সেরা আলিম..
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক হাদীস সংগ্রহকারীদের অন্যতম।

***

এরপর প্রথম আকাবার বাইআত সংঘটিত হলো। বাইআতকারীরা মদীনায় নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গেলেন এবং কওমের লোকদের সত্য ও হেদায়েতের দীনের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকলেন...

কিন্তু অল্পদিনেই তারা অনুভব করলেন যে, তাদের একজন শিক্ষক প্রয়োজন-যিনি কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে তাদের চেয়ে বেশি জ্ঞাত হবেন এবং ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে হবেন বেশি অভিজ্ঞ।

ফলে তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন পেশ করলেন, তাদের দীন শেখানোর জন্য একজন যোগ্য শিক্ষক পাঠাতে।

এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাদের কাছে পাঠালেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে।

ফলে ভূপৃষ্ঠে তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম সুসংবাদবাহী।

***

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনায় অবতরণ করলেন, মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করতে এবং ইসলামী শরীয়তের বিধিবিধানের শিক্ষা প্রদান করতে শুরু করলেন।

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী, কখনো নীরব বসে থাকতেন না। ছিলেন কর্মঠ, উদ্যমী-অলসতা কখনোই করতেন না।

ফলে তার প্রচেষ্টায় প্রচুর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন...

অবশেষে অবস্থা এই হলো যে, ইয়াসরিবের প্রতিটি ঘরে ঘরে কমপক্ষে একজন মুসলিম পুরুষ বা একজন মুসলিম নারীর উপস্থিতি অবশ্যই পাওয়া যেত।

এমনকি তার নামে লেখা হয় এই বিরল সম্মানের কথা যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের পূর্বে সর্বপ্রথম সেখানে জুমার জামাত কায়েম করেন তিনিই।

***

যখন হজের মৌসুম এল, মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সত্তরজন মুসলিমকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় রওনা করলেন। তারা সবাই আকাবাতে রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং বিখ্যাত আকাবার বাইআত সম্পন্ন করলেন।

বাইআত গ্রহণকারীরা হজের পর মদীনায় ফেরত চলে গেলেন আর মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মক্কায় থেকে গেলেন ততদিন পর্যন্ত যতদিন না আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের জন্য মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন।

তিনি নিজে এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাই ছিলেন মদীনার প্রথম হিজরতকারী।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরে কুরাইশদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত পাকা করলেন এবং সৈনিকদের বিভিন্ন দল ও উপদলে ভাগ করলেন। মুহাজির দলের আমীর বানালেন আলী ইবনে আবু তালেব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে...

আর আনসার দলের আমীর বানালেন সাআদ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে...

সেনাদলের ডান পাশের নেতৃত্ব তুলে দিলেন যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে...

আর বাম পাশের সেনানেতৃত্ব দিলেন মিকদাদ আল-কিন্দী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে...

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদা পতাকা দিলেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে। তিনি নিজের পবিত্র দুই হাতে পতাকাটি তাকে সমর্পণ করলেন। মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেটা গ্রহণ করলেন সম্মানের সঙ্গে, আনন্দ প্রকাশ করে। আর সেটা হাতে নিয়ে মাথা উঁচু করে সেনাদলের আগে আগে চলতে লাগলেন। পতাকার মর্যাদা রক্ষা করে বীরপুরুষের মতো এগিয়ে গেলেন।

বদর যুদ্ধ শেষে ফেরার পথে মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ভাই আবু উযাইরকে এক আনসারীর হাতে বন্দী দেখতে পেলেন, বন্দী ভাই চাচ্ছিলেন তাকে ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

তার এ কথা শুনে মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আনসারীকে বললেন,

'ওকে শক্ত করে বেঁধে রাখো।

কেননা, ওর মা বিপুল ধন-শ্বৈর্যের মালকিন, যত অর্থই লাগুক তার মা তাকে মুক্ত করিয়ে নেবে।'

তখন বন্দী আবু উযাইর তার ভাই মুসআবকে আক্ষেপ করে বললেন,
'এই কি তোমার নিজের ভাইয়ের প্রতি সমবেদনা?'

মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন,

'তুমি আমার ভাই কী করে? তুমি নও, তোমাকে গ্রেফতারকারী মুসলিম আমার ভাই। তুমি একজন মুশরিক, কোনো মুসলিমের ভাই হওয়ার যোগ্য তুমি নও।'

***

ওহুদ যুদ্ধের দিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পতাকা সমর্পণ করলেন মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে, যেমন করেছিলেন বদর যুদ্ধের দিন... মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পতাকা উঁচু করে ধরে রাসূলের আগে আগে যাচ্ছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর ওপর কুরাইশের আক্রমণের পাল্লা ভারী হয়ে উঠল। এমনকি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকেও দূরে সরে পড়েন, কিন্তু সেই কঠিন মুহূর্তেও মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলের পাশে দৃঢ়পদে অবস্থান গ্রহণ করেন, একচুল পরিমাণ এদিক সেদিক করেন না।

আর তখন তার সামনে এসে পড়ে দুর্বৃত্ত মুশরিক সৈনিক ইবনে কামিআ। মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তরবারি দিয়ে চরম আঘাত করে। তার পতাকা ধরে রাখা হাত কেটে মাটিতে পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে পতাকাটিও মাটিতে পড়ে যায়।

তিনি অন্য হাত দিয়ে পতাকাটি উঁচু করে ধরেন...

দুর্বৃত্ত ইবনে কামিআ আবারও ফিরে এসে দ্রুত আক্রমণ চালায়, দ্বিতীয় হাতটিও কেটে পড়ে যায়, সঙ্গে পতাকাটিও মাটিতে পড়ে যায়। এবার কেটে পড়া দুই হাতের বাহু একত্র করে তিনি ইসলামের পতাকা উঁচু করে রাখেন।

দুরাচারী ইবনে কামিআ আবারও তার কাছে ফিরে এসে তৃতীয় আক্রমণ চালায়, এবার তরবারি নয় বর্শা ছুঁড়ে মারে তার বুকে। তিনি শহীদ হয়ে মাটিতে পড়ে যান, তার ভাই আবুর রউম এসে ইসলামের পতাকা উঁচু করে ধরেন এবং এভাবেই পতাকা উঁচু করে মদীনায় ফিরে যান।

কুরাইশ বাহিনী বিজয়ী হয়ে ময়দান থেকে বের হয়। মুসলিম বাহিনী শহীদদের লাশ দাফনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

আর তখনই দেখা গেল দুই হাত কাটা মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশ পড়ে আছে।

***

মুসলিম বাহিনী শহীদদের লাশ দাফন করতে চাইলেন...

মুসআব ইবনে উমাইর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য তারা ছোট্ট একটি কাফন ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেলেন না। সেটা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা আলগা হয়ে যায়, আর পা ঢাকলে মাথা আলগা হয়ে যায়।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলেন, মাথার দিকটা কাপড় দিয়ে আর পায়ের দিকটা কোমল ঘাস-পাতা দিয়ে ঢাকতে।

এরপর তিনি কাফনে আবৃত মুসআব রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পাশে এসে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বাণী তিলাওয়াত করলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

'মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে, তারা তাদের সংকল্প মোটেও পরিবর্তন করেনি।' - সূরা আহযাব: (৩৩) ২৩

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার

আলহামদুলিল্লাহ, সমগ্র প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি মানবজাতিকে হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ বান্দা ও শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। আর যাঁদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবায়ে কেরাম।

এই গবেষণার মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারলাম যে, সাহাবায়ে কেরাম ইসলামি সভ্যতার মূল স্তম্ভ, কুরআন ও সুন্নাহর ধারাবাহিক সংরক্ষক, এবং আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) ইসলামের ইতিহাসে এমন এক স্বর্ণালী প্রজন্ম, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনের প্রচার, সংরক্ষণ ও বাস্তব রূপায়ণ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের জীবন ছিল ঈমান, ত্যাগ ও আমলের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই গবেষণার প্রতিটি অধ্যায়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তাঁদের মর্যাদা, সম্মান, পারস্পরিক মতভেদে আদব, এবং বিভ্রান্ত মতের জবাব স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।

সাহাবীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন আমাদের ঈমানের অংশ, কারণ নবীজির (সা.) উম্মত হিসেবে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রাখা ঈমানের দাবি। অন্যদিকে, তাঁদের প্রতি কটুক্তি বা সন্দেহ সৃষ্টি করা ঈমানের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ।
তাই এ গবেষণার সারমর্ম হলো সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন আল্লাহর মনোনীত বান্দা, যাঁদের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের নিদর্শন এবং যাঁদের আদর্শ আজও দ্বীনি জীবনের প্রেরণা। তাঁদের জীবনচর্চা থেকে শিক্ষা গ্রহণই প্রকৃত মুসলিমের করণীয়।

পরিশেষে বলা যায়, সাহাবীদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অনুসরণ বজায় রাখার মধ্য দিয়েই ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য রক্ষা পায়। এ উপলব্ধিই এই গবেষণার মূল লক্ষ্য ও অর্জন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসা দান করুন,
তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তাওফিক দিন,
এবং কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে তাঁদের সঙ্গে জান্নাতে একত্রিত করুন।

آمين يا رب العالمين.